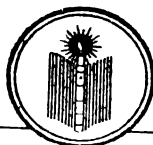
সাহিত্য ও সাহিত্যিক

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়



ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট · কলিকাতা – ৬

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৬৩

মূল্য দুই টাকা মাত্র

প্রচ্ছদশিল্পী : হৈমন্তী সেন

৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬, ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৩বি. বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা-৬. বাণী-শ্রী প্রেসের পক্ষে শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত

এই বইয়ের প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত। গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করতে গিয়ে এদের কোনো-কোনোটির কিছু কিছু পরিমার্জনা করা হয়েছে।

রচনাগুলি বিচ্ছিন্ন হলেও এদের মধ্যে ভাবগত যে যোগসূত্রটি আছে, আশা করি তা সহৃদয় পাঠকের লক্ষ্য এড়িয়ে যাবে না।

কলকাতা

১লা আষাঢ়,

১৩৬৩

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সূচী ঃ

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

বিভূতিভূষণের শিল্পীসত্তা

॥ ১ ॥

আধুনিক কালের কাব্য-ব্যক্তিত্বের চাইতে ঔপন্যাসিক-ব্যক্তিত্বকে চিনে নেওয়া সহজ। কারণ এ-যুগের 'ইমেজিজ্‌ম' এবং প্রতীকিতার অঙ্গরাগে সাম্প্রতিক কবিতার অন্তত বহিরংশে এমন একটা সাধারণধর্মিতা এসেছে যে তা থেকে স্বভাবতই কোনো কবির একান্ততা বেছে নেওয়া কঠিন হয়—যদি না সেই কবি কোনো বিশিষ্ট দার্শনিকতায় উদ্ভাসিত থাকেন। অপেক্ষাকৃত পূর্বগামিদের মধ্যে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব, সমর সেন এবং আধুনিকতর পর্বে সুভাষ-সুকান্তের যে সুস্পষ্ট আত্মবলয় আছে—বাংলা দেশের অন্যান্য অধিকাংশ কবিদের, সহজে সে ভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। একথার মধ্যে এমন ইঙ্গিত অবশ্যই নেই যে এঁরা ছাড়া বাঙলা-সাহিত্যে আর কেউ স্মরণযোগ্য কবি নন। আরো অনেকেই ব্যক্তি-বৈচিত্র্যে দীপ্ত, অনেক কবিই শক্তি এবং সততার সঙ্গে লেখনী চর্চা করছেন, তাঁদের জন্যে আমাদের গর্বিত হওয়ারও কারণ আছে। তালিকা দীর্ঘ না করে কয়েকজনের মাত্র উল্লেখ করলাম। আমার বক্তব্য হল, এঁদের প্রধান অংশই যতটা গোষ্ঠিক, ততটা ব্যক্তিক নন।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিত্বের মূল্য অনস্বীকার্য। জীবনানুভূতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং ঈয়েট্সের সহমর্মিতা আছে—তবু রবীন্দ্রনাথ আর ঈয়েট্স এক নন। অথবা অতটা দূরবিস্তৃত না হয়েও খুব কাছাকাছি এবং সহজ দৃষ্টান্ত আশ্রয় করে বলা যায় বুদ্ধদেব বসু আর অজিত দত্তের গোত্র এক হলেও রচনা পদ্ধতিতে ও চিত্রকল্পে ওঁদের স্বাতন্ত্র্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। জীবনদর্শন এক হলেও আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য, উপলব্ধির গভীরতা ও ব্যাপ্তির তারতম্য, সাংকেতিকতা এবং চিত্রকল্পের নিজস্বতা—এইগুলোই কবির চরিত্রবৃতি। আর এই চারিত্রিকতার অভাব ঘটলে কবি অনুচ্ছেদ হতে পারেন, কিন্তু পরিচ্ছেদ হতে পারেন না।

কবিতা, ছবি এবং গান—শিল্প হিসেবে এরা যতটা আত্মলীন ও ভাবকেন্দ্রিত, কথা-সাহিত্য তা নয়। এমনকি, নাটকেও এ-যুগে যতটা বিশুদ্ধ ভাবাশ্রয়িতা চোখে পড়ে (সাংকেতিক নাটকের সাহায্যে যার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে—এবং এ-কালের সার্ত্রের নাটকে যার উৎকর্ষ লক্ষণীয়) —উপন্যাসে তা সম্ভব নয়। উপন্যাস রূপক হতে পারে—সার্ভেন্টিস্ তা লিখেছেন, আনাতোল ফ্রাঁসের 'পেঙ্গুয়িন আইল্যাণ্ড' বা 'রিভোল্ট্ অব দি এঞ্জেল্স্' আমরা পেয়েছি—অতি আধুনিক কালে লাগেরভিস্টের 'দি ডোয়ার্ফ'ও রয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের সাংকেতিক হওয়া একেবারে অসম্ভব কিনা জানি না—তবে সহজ যে নয়, এ-কথা ঠিক।

তার কারণ বোধ হয় এই। আর্ট হিসেবে উপন্যাস সব চেয়ে আটপৌরে এবং কবিতা, ছবি, গান কিংবা সাংকেতিক নাটকের ক্ষেত্রের মতো পাঠক, শ্রোতা বা দর্শকের সেখানে অতটা অধিকারীভেদ নেই। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যই হল তার সর্বজনীনতা। আর যে শিল্প সার্বিক, সেখানে শিল্পগত রূপও স্পষ্টরেখ। ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিত্ব সোচ্চার। ঈয়েট্স্ যদি উপন্যাস লিখতেন তা হলে 'গোরা' কিংবা 'ঘরে বাইরে'র লেখকের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য নির্ণয় করতে কিছুমাত্র সময় লাগত না। নাট্যকার গল্সওয়ার্দির ভূমিকা ইংরেজি সাহিত্যে নির্বিশেষ—কিন্তু 'ফরসাইট্ সাগা' অনন্যতায় চিরদীপ্ত।

ছবি, কবিতা কিংবা গান (এমন কি নাটকও) স্বস্থানে স্বমহিম। এরা দৈনন্দিন লোক-ব্যবহারের জন্যে নয়—মন, মেজাজ এবং অবসর নিয়ে এদের কাছে পৌঁছুতে হয়, এদের প্রয়োজনের রূপ যতখানি তার চাইতে বেশি প্রসাধনের রূপ। উপন্যাস পথের মানুষ—কাছের লোক, দিনযাত্রায় সম্পর্কিত। এহেন অন্তরঙ্গ প্রতিবেশীদের পৃথক করে আমরা সহজেই চিনে এবং জেনে নিতে পারি। একান্ত প্রতিভা-দৈন্যের যুগেও যে-কোনো অন্য শিল্পের চাইতে উপন্যাসের ব্যক্তিত্ব সুনির্দিষ্ট।

এইজন্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা খুব স্পষ্ট করেই চিনি। আমরা জানি, তিনি শরৎচন্দ্র নন, শৈলজানন্দ নন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তারাশঙ্কর নন। আর শুধু

ব্যক্তি-পার্থক্যই নয়; বিভূতি-ভূষণের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের কথা ছেড়ে দিলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য এতই অসাধারণ, যে সেদিক থেকে বাঙলা সাহিত্যের খুব কম ঔপন্যাসিকই তাঁর সমপর্যায়ী।

বিভূতিভূষণ বহুলপ্রসবী লেখক। উপন্যাস, ছোট গল্প, ভ্রমণ-কাহিনী, ডায়েরী-সাহিত্য, অতি-প্রাকৃত এবং 'বিচিত্র জগতে'র ভৌগোলিক বৈচিত্র্য সব কিছু সম্পর্কেই তাঁর 'উৎকর্ণ' কৌতূহল। কিন্তু 'পথের পাঁচালী' থেকে 'দেবযান' পর্যন্ত বিভূতিভূষণের একটিমাত্র পরিচয়ই প্রধানত অভিব্যক্ত। আর তাঁর সেই মূল ব্যক্তিত্বটিই এই প্রসঙ্গের আলোচ্য।

বাঙলার গ্রামাঞ্চলে শিক্ষকতা, আর ভাগলপুরের বনজঙ্গলে জমিদারী কাজের অভিজ্ঞতা—মোটামুটি এই হল বিভূতি-ভূষণের কর্মজীবন। তাঁর সাহিত্যও বিশেষভাবে গ্রামিক এবং আরণ্যক। এক রবীন্দ্রনাথের ছাড়া বাঙলা উপন্যাসে নাগরিক মনন নেই বললেই চলে। সুতরাং গ্রামিক মানুষের দিক থেকে বিভূতিভূষণ বাঙলা সাহিত্যের চিরচলিত ধারাকেই আশ্রয় করেছেন। কিন্তু বিভূতিভূষণের গ্রামীণতা শরৎচন্দ্রীয় নয়; শরৎচন্দ্রের পল্লী যেখানে চণ্ডীমণ্ডপ এবং গ্রাম্যজটলায় অভিব্যক্ত—যেখানে তা প্রাচীন সমাজের অবক্ষয়ের প্রতি সচেতনভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, বিভূতি-ভূষণের গ্রামীণতা সেখানে আমের জামের বনে, নিবিড় কলমীদামে ছাওয়া পুরনো দীঘি আর ইতিহাসের কুহেলী

মাখানো প্রাচীন প্রাসাদের আশে পাশে, আঁশশ্যাওড়া আর কালকাসুন্দির ঝোপে ছাওয়া এক চিল্‌তে সরু পথ দিয়ে মেটে খরগোস আর নীলকণ্ঠ পাখির সন্ধানে যাত্রা করে। শরৎচন্দ্রের মধ্যে গ্রাম-জীবনের এক সুপ্রবীণ অভিজ্ঞতা আর বিভূতি-ভূষণের মধ্যে কাশফুলের দোলন-লাগা শরতের দুপুরবেলায় ঘর-পালানো একটি কিশোর মনের স্বাপ্নিকতা।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে এই কৈশোরই একান্তভাবে অন্তর্লীন। কৈশোরের আরো একটা দিকও আছে—তার বিদ্রোহ, তার প্রতিবাদ—তার উদ্দামতা। কিন্তু বিভূতি-ভূষণের 'অপু'র মধ্যে কোথাও 'ইন্দ্রনাথ' নেই। বিভূতি-ভূষণ অস্বীকার করেননি—এড়িয়ে গেছেন। 'বিদ্রোহী নবীন বীরের' জন্যে সাধনা করেননি তিনি—'ছিন্নবাধা পলাতক বালকে'র আত্ম-সন্তুষ্টিতেই তিনি নিমগ্নচেত।

খুব সংক্ষেপে বলা যায়—বিভূতিভূষণ আস্বাদনপন্থী, বিশ্লেষণপন্থী নন। জীবনের ব্যাখ্যাতার ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেননি, তিনি জীবনের উপভোক্তা। বৈষ্ণবেরা বলেছেন, অরসজ্ঞ কাক জ্ঞান-নিম্বফলের তিক্ততা খোঁজে—আর রসজ্ঞ কোকিল প্রেমরূপ আমের মুকুলের মধু পান করে থাকে। বিভূতিভূষণ কোকিলবৃত্ত।

যে-কালে বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের আবির্ভাব, সেটি সোজাসুজি প্রশ্নের যুগ। শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন', রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ', 'কল্লোলের' দহনদীপ্তিতে বাঙালীর মন উত্তপ্ত।

বাঙালীর বুদ্ধিবাদের মধ্যে নৈরাশ্য এবং ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণুতা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তির্যক আক্রমণ, রাঢ়ের দগ্ধ তৃণ-প্রান্তর থেকে তারাশঙ্করের রূঢ় রুক্ষ পদক্ষেপ। দেশে অসহযোগ আন্দোলন এবং তার অন্তরালে বিপ্লববাদের আগ্নেয়ফল্গু। সুকঠিন অর্থনৈতিক সমস্যা এবং তিক্ততার চরম।

এক কথায় বাঙালির মন এবং বাঙলা সাহিত্য তখন অঙ্গারশয্যা। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের মতো সাধননিষ্ঠ চেতনা পর্যন্ত বিচলিত। এই দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে কোনো সুমহান নাগরিক সাহিত্য যে গড়ে উঠেছে তাও নয়—সেটা অসম্ভবও বটে, কারণ যে-কোনো একটি প্রত্যয়ের ভিত্তি না থাকলে উপন্যাসের সামগ্রিক কারু-শিল্প রচিত হতে পারে না। পারম্পর্যহীন খণ্ডছিন্ন নাগরিক জীবনের টুকরোগুলো তখন অসংখ্য ছোটগল্পে বিকীর্ণ হয়ে পড়ছে। লক্ষ্য করবার মতো—একমাত্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া সে-যুগে স্মরণীয় উপন্যাস কেউই লিখতে পারেননি—শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি তখন স্পষ্টতই ব্যর্থতায় আচ্ছন্ন।

পূর্ণ সংশয়ের যুগে—শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্নের' কালে বিভূতিভূষণই একতম সিদ্ধ ঔপন্যাসিক। তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক সাফল্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আরো কিছু পরে—এবং তা হয়েছে রাজনৈতিক বোধের সুনিশ্চিত প্রত্যয় ভূমিতে। আর বিভূতিভূষণের এই কৃতিত্ব নিহিত রয়েছে তাঁর 'অস্তিবাদে'র মধ্যে।

নিশ্চিন্দিপুরের ছায়া নিবিড় জীবন পরিবেশ থেকে বিভূতিভূষণ যে 'পথের পাঁচালী' নিয়ে এলেন—তাকে গ্রহণ করতে বাঙালি পাঠক মুহূর্তের জন্যেও দ্বিধা করল না। যেন অঙ্গারশয্যার ওপরে শীতল পদ্মপাতা বিছিয়ে দিলেন তিনি—পদ্মদীঘির মিষ্টিজল নিয়ে এলেন তৃষ্ণার্তের জন্যে। যারা পল্লী কৈশোরের (এবং পল্লী শৈশবেরও) সহজ স্বপ্নে ভরা দিনগুলিকে পেছনে ফেলে এসেছে, তারা তা তাঁর কাছ থেকে নতুন করে ফিরে পেল; যাদের সে জীবন কখনো ছিল না—তারা পেল এক আশ্চর্য জগতের সন্ধান। বাস্তব জল-মাটি আকাশ-অরণ্যের পটভূমিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠল এক রূপকথার পৃথিবী।

ঠিক কথা। 'পথের পাঁচালী'তে বিভূতিভূষণ রূপকথাই শোনালেন। আমরা জ্বালা ভুলে গেলাম, অভিযোগ ভুলে গেলাম, তিক্ততা ভুলে গেলাম। মনে হল, "এখনো অনেক রয়েছে বাকী।" শহরের জীবনে যখন নিরবচ্ছিন্ন ক্ষতির খতিয়ান—তখন এই বাংলা দেশেরই গ্রামপ্রান্তে একটা 'সব পেয়েছি'র জগৎ আছে। সেখানে দারিদ্র্য, দুঃখ, বেদনা, শোক সবই আছে, কিন্তু তাদের সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে এমন একটি মধুমান প্রশান্তি বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে যে তার আশ্রয়ে এখনো নিশ্চিন্তে নিমগ্ন হয়ে থাকা যেতে পারে।

॥ ২ ॥

বিভূতিভূষণের 'অপু' শহরে এল। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও নিশ্চিন্দিপুরের ছেলেটি নিজের অস্তিত্ব স্বাতন্ত্র্য ভোলেনি। নাগরিক জীবনের নানা অভিজ্ঞতার সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছে সে, বিচিত্র মানুষকে দেখেছে, কিন্তু তারা কেউই তার শৈশব চরিত্রকে একান্তভাবে প্রভাবিত করেনি। ঘরছাড়া বহিঃপ্রকৃতির আহ্বান নিজের ভেতরে থেকে সে সঞ্চারিত করে দিয়েছে তার উত্তর পুরুষের মধ্যে। স্রষ্টা আর সৃষ্টির মধ্যে এমন অভিন্নতা খুব বেশি চোখে পড়ে না। অপু বিভূতিভূষণের ব্যক্তিত্বেরই প্রতিনিধি।

যে কোনো ঔপন্যাসিকেরই জীবন-দর্শন থাকে। কখনো তা ব্যক্তিক, কখনো গোষ্ঠিক, কখনো সামাজিক ; কখনো সে দর্শন অভিনব—কখনো ঐতিহ্যানুসারী। বিভূতিভূষণের দর্শন ঐতিহ্যকে অতিক্রম করেনি। তিনি তারাশঙ্কর বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কোনো নিজত্বে দীপ্তিমান নন।

খুব সহজেই চোখে পড়বে—যাকে নতুন কথা বলা যায়, বিভূতিভূষণের মধ্যে তা নেই। কোনো নতুন সত্যের দিকে তিনি অভিযান করেননি—তাঁর রচনায় যুগ-সচেতন সাহিত্যিকের প্রশ্ন চিহ্ন লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত। ঝড়ের যুগে বিভূতিভূষণের প্রশান্তি ঈর্ষ্যা করবার মতো। তাঁর কোনো কোনো রচনায় সামাজিক সমস্যার 'অথৈ জল' যে

আভাসিত হয়ে ওঠেনি তা নয়—কিন্তু সমগ্রভাবে বিভূতিভূষণ নির্মোহ। চারদিকের তরঙ্গিত সমুদ্রের মাঝখানে তিনি দ্বীপে বাস করে গেছেন।

এই আত্মতৃপ্তি কি ভালো ?

সে আলোচনা থাক। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে এই আত্মতৃপ্তিই বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা সামগ্রিকতা এনে দিয়েছে—তাঁর উপন্যাসকে দিয়েছে একটা নিটোল পরিপূর্ণতা।

বিভূতিভূষণের বিশেষত্ব হল তাঁর বিশ্বাসপ্রবণতা। এই সরল ভাগবত-প্রাণতার জন্যেই তাঁর রচনায় প্রশ্ন নেই। বাঙলার গ্রাম এবং বাঙালি পরিবারের (বিশেষত, বাঙালি নিম্নবিত্তের) নিখুঁত চিত্র তাঁর অসংখ্য গল্প উপন্যাসে আছে। ছোট সুখ, ছোট ব্যথা, ব্যর্থ আশা-আকাঙ্ক্ষার কারুণ্যে তাঁর বহুচিত্র, বহুচরিত্র অশ্রুস্নিগ্ধ। কিন্তু দেশ-কালের সঙ্গে ব্যক্তি-মানসের সংঘাতে, তার নানামুখী আত্মদ্বন্দ্বে যে গভীরব্যাপ্ত ট্রাজেডি বিকশিত হয়—সেই ট্রাজেডির প্রচণ্ডতা তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় না। এমন যে 'অনুবর্তন'—সেখানেও শিক্ষক জীবনের রূপটি মাত্র কারুণ্যঘন—তা থেকে সমাজের চিরলাঞ্ছিত এই সম্প্রদায়টির ওপর অত্যাচার-উৎপীড়নের কোনো ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ আমাদের বুকের মধ্যে আড়োলন তোলে না—একটা শান্ত সহানুভূতিই সেখানে আমাদের আচ্ছন্ন করে তোলে।

যে জীবন দৈবায়ত্ত—সেখানে অশ্রুমোচন করা যায়—প্রতিবাদ করা চলে না। বিভূতিভূষণও প্রতিবাদ তোলেননি। তারাশঙ্করের পুরুষকার বিভূতিভূষণে নেই, তিনি বৈষ্ণবদের মতো সমর্পিত প্রাণ। বলা বাহুল্য, আত্মসমর্পণের মধ্যে যে প্রশান্ত আনন্দ আছে, তার আকর্ষণ পরম লোভনীয়। যে তন্ময়তার মধ্যে বিভূতিভূষণ নিবিষ্টচিত্ত, তা আমাদেরও প্রলুব্ধ করে তোলে। তাই তাঁর শান্ত রসাশ্রিত ঐশ্বরিক প্রীতির স্থায়ী ভাবের মধ্যে আমরাও একটি নিরাপদ জায়গা খুঁজে পাই।

ব্যক্তি জীবনেও বিভূতিভূষণ বাসা বেঁধেছিলেন বনগ্রামের একটি পল্লী অঞ্চলে আর সাধনক্ষেত্র নির্বাচিত করেছিলেন ঘাটশিলায় পাহাড় জঙ্গলে। গ্রামীণ বিভূতিভূষণ স্বাভাবিক নিয়মেই এমনভাবে অরণ্য পথের পথিক হয়ে উঠেছেন। প্রত্যক্ষ জীবনের মাঝখানে বাস করে তার সংঘাত—তার জিজ্ঞাসাগুলোকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। তারা অবাঞ্ছিত হলেও অনাহূত আগন্তুকের মতো অনিবার্য ভাবেই এসে পড়তে চায়। সেই জন্যেই শেষ পর্যন্ত 'আরণ্যকে'ই তাঁর বাঞ্ছিত মুক্তি—'কুশল পাহাড়ী'র তীর্থযাত্রায় তাঁর বিস্তীর্ণপক্ষ স্বাচ্ছন্দ্য।

বিভূতিভূষণের ঐশ্বরিকতা রবীন্দ্রনাথের মতো নয়। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরপ্রবণতা আচার আচরণে আশ্রিত হয়নি; তা উপনিষদের নিরঞ্জন উপলব্ধি—তার রূপটি বিশুদ্ধ ভাবাশ্রয়ী। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ লোকসংস্কারের

অনুগামী। তিনি অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাস করেছেন—'তারানাথ তান্ত্রিকে'র গল্পগুলি এই বিশ্বাসসিদ্ধ; 'দৃষ্টিপ্রদীপ' তাঁর কাছে সহজ স্বাভাবিক—'দেবযান' নাকি তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির ফল। প্রকৃতি সম্পর্কে আস্বাদ্যমানতা ছাড়াও ধর্ম সংস্কারের প্রতি এই অনুরাগ, এবং অর্ধস্ফুট অতীতের প্রতি একটা বিমুগ্ধ আকর্ষণ বিভূতিভূষণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এগুলি যুক্তিসিদ্ধও। বর্তমানের স্পষ্টরেখ বাস্তবতা এবং নিষ্ঠুরতার কাছ থেকে অপসৃত হওয়ার পক্ষে এদের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। মানুষ যে মুহূর্তেই বাস্তবাতীত কোন নির্ভরযোগ্য শক্তির আশ্রয় পায় সেই মুহূর্তেই নিজের ভার সে তার ওপরে চাপিয়ে দিতে চায়। তখন তার ভূমিকায় আর প্রশ্নকর্তা থাকে না, থাকে একটি কৌতূহলী মন—যে বিহ্বল বিমুগ্ধ চিত্তে সব কিছু দেখতে চায়, সুতীক্ষ্ণ সজাগ বুদ্ধির আলোকে বিচার করতে চায় না।

এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করে বিভূতিভূষণ নিজেকে নিয়ে গেছেন অরণ্যে। তাঁর অরণ্যবিলাসী মন নিত্যকালীন আদিম প্রকৃতির প্রাণক্ষেত্রে একটি অপূর্ব পূর্ণতা পেয়েছে, তাঁর প্রকৃতি পিপাসা এখানে আকণ্ঠ তৃপ্তি লাভ করেছে—বনশ্রীতে দু-চোখ তিনি ভরে নিয়েছেন। এখানকার মানুষগুলিকে তিনি দেখেছেন প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে, যারা বনের ফুলের মতো সহজভাবে ফোটে—সহজভাবেই ঝরে যায়। বনের একটি পাখি, একটি প্রাণীর মতোই মানুষের

জীবনও এখানে সমাজের শক্তিতে চালিত হয় না—তাকে নিয়ন্ত্রিত করে স্বাভাবিকতা আর এই স্বভাবের নেপথ্যে গুহাহিত শক্তি ঃ বিভূতিভূষণের ঈশ্বর।

শুধু এইটুকুই সব নয়। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত সে ক'টি জিনিস আদিম দিনের প্রতিনিধিত্ব করে, তারা হল আকাশ-সমুদ্র-পাহাড় এবং অরণ্য। ঐশ্বরিক উপলব্ধিতে আকাশের আবহ তো আছেই—সে সর্বময়; সমুদ্র সম্পর্কে বিভূতি-ভূষণের মনোভাব জানা যায় না—বোধ হয় সমুদ্রের মধ্যে দেবতার চাইতেও দানবিক শক্তিকেই তিনি বেশি করে প্রত্যক্ষ করে থাকবেন। কিন্তু পাহাড় এবং জঙ্গল সম্পর্কে নিবিড় প্রীতি আর আকর্ষণ বিভূতিভূষণের সাহিত্যে বিপুল-ভাবে উৎসারিত।

ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভের এমন ক্ষেত্র আর কী হতে পারে? বহুকালের অক্ষয় শিলার স্তরে স্তরে অতীতের কত ইতিহাস যে প্রচ্ছন্ন আছে কে জানে? প্রাগৈতিহাসিক কালের ফসিল থেকে আরম্ভ করে অগণ্য সাধক সন্ন্যাসী এই পাহাড়ের আশ্রয়েই তাঁদের সিদ্ধিলাভকে চিহ্নিত করে রেখে গেছেন। এ এক গভীর গম্ভীর মহাকাল মূর্তি। আর অরণ্য? এইখানেই মানুষের আধুনিক অবিশ্বাসের যন্ত্রপাতি এবং নাগরিকতার উপদ্রব সেই—এইখানেই জীবন এবং জগৎ আদিম প্রাণ আর ধ্যানী মানুষের মাঝখানে আড়াল সৃষ্টি করে দাঁড়াতে পারে না।

তাই বিভূতিভূষণ এমন ভাবে অরণ্যচারী। তাঁর প্রথম জীবন প্রকৃতির যে সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছিল বাঙলার পল্লীর ছায়া নিবিড় পথে-ঘাটে, সেই প্রকৃতির পূর্ণতর আধ্যাত্মিক রূপটিকে প্রত্যক্ষ করবার জন্যেই উত্তরকালে তিনি অরণ্যে এসে পৌঁছেছেন। অরণ্যের অকৃত্রিম আদিমতায় বিশ্বনিহিত শক্তির সঙ্গে তাঁর সর্বাঙ্গীণ মিলন সাধিত হয়েছে। লোক সংস্কার, বিশ্বাস, প্রকৃতির প্রতি আসক্তি, প্রয়াসহীন আত্মসমাহিতি—এরা সকলেই সেই সম্পূর্ণতায় উত্তীর্ণ হওয়ার এক-একটি উপায়মাত্র।

কিন্তু এই আলোচনা থেকে এ কথা মনে করবার কারণ নেই যে জীবন সম্পর্কে বিভূতিভূষণ মমত্বহীন। বরং বাঙলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষের এত বিচিত্র পরিচয় খুব বেশি লেখক দিতে পারেননি এবং তাদের ছোটখাট দুঃখ সুখ আশা অভীপ্সার কথা এক শরৎচন্দ্র ছাড়া আর কেউই বিভূতিভূষণের মতো করে বলতে পারেননি। কখনো কখনো যেন তিনি শরৎচন্দ্রকেও ছাড়িয়ে গেছেন। সহানুভূতি এবং সমবেদনার অজস্র অশ্রুবিন্দু তাঁর সাহিত্যে বিকীর্ণ হয়ে আছে। কিন্তু এই সহানুভূতি সেই মানুষেরই—যিনি সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এই হয়—একে স্বীকার করো। এ কথা তাঁর কাছে শোনা যায় নাঃ এ হওয়া উচিত নয়, একে স্বীকার করব না। যেমন প্রতিটি সৎ মানুষেরই অন্যায়-অত্যাচার সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক ঘৃণা থাকে, বিভূতিভূষণেরও তা আছে।

কিন্তু থাকলেও তা ঈশ্বরানুগতায় ক্ষমাস্নিগ্ধ—তার বিরুদ্ধে না মানসিক—না ঘটনাগত কোনো প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়াই নেই। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের বঙ্কিম জীবনদৃষ্টি এবং তারাশঙ্করের পুরুষকারের প্রেক্ষাভূমিতে বিভূতিভূষণের এই ভূমিকাটি তাই কৌতূহলোদ্দীপক।

আর এই কারণেই 'অপু' নামিক বিভূতিভূষণের ব্যক্তিত্বটি ছাড়া—তাঁর এতগুলি রচনায় কোনো বিশেষ মহান চরিত্র পাওয়া যায় না। জীবনের নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাত তাঁর অনেক চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্যতা হয়তো এনেছে—কিন্তু স্মরণীয়তা আনেনি। 'টাইপ' চরিত্র অনেক আছে—তারা পর্যবেক্ষণজাত—সৃষ্ট নয়। আর এমন হয়েছে খুব স্বাভাবিক কারণেই। যুগ এবং সমাজের বিরোধকে যিনি পাশ কাটিয়েই যেতে চেয়েছেন—তাঁর কাছে সংক্ষুব্ধ কালের কোনো প্রতিনিধি মানুষকেই দাবি করলে সেটা অবিচার হয়েই দাঁড়াবে।

আত্মসমাহিত প্রশান্তিতে এবং করুণার স্নিগ্ধতায় বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট-চিহ্নিত। সমুদ্রের মাঝখানে তাঁর দ্বীপটিকে দেখতে এবং চিনতে ভুল হয় না। তাঁর অস্তিবাদী জগতে প্রবেশ করতে পারলে, তাঁর আরণ্যক ধ্যানলোকে মগ্ন হতে পারলে এখনো এমন শান্তি আর সান্ত্বনা মেলে—যার সন্ধান অন্যত্র দুর্লভ।

আর স্বাভাবিকতার সেই রাজ্যটিতে পৌঁছুবার পথ

বিভূতিভূষণের স্টাইল। এত সহজ সুন্দর ভাষা এবং শিল্পরীতি বাঙলা সাহিত্যে বোধ হয় আর কারোই নেই। এ স্টাইল আদর্শ কিনা জানি না, কিন্তু এর মধ্যে বিভূতি-ভূষণের ব্যক্তিত্বটি আরো পরিষ্কারভাবে ধরা দিয়েছে। সহজ গুণই এই স্টাইলের বিশেষত্ব--আর এ কথা কে না জানে যে সব চাইতে সহজ করে বলতে পারাটা সব চাইতে কঠিন কাজ।

মোহিতলালের কবিমানস

উনিশ শতকের প্রথম অধ্যায়টা ইয়োরোপে বেদনাবাদের যুগ। শেলীর কবিতা থেকে শপ্যাঁর মেলোডি পর্যন্ত একটা নিরবচ্ছিন্ন বিষাদের সুর বাজছে। হাইনের রিক্ততা, শুবার্টের বিষাদমূর্ছনা আর আর্থার সোপেনহাওয়েরের দর্শন এ যুগের মানসক্ষেত্রের বহু বিচিত্র অভিব্যক্তি।

এর পেছনে একটা সামাজিক এবং রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল। ফরাসী বিপ্লবের অপমৃত্যু ঘটল মধ্যপথেই। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রধানতম প্রতিনিধি নাপোলিয়াঁর দিন কাটতে লাগল সেণ্ট হেলেনায় সমুদ্রের তরঙ্গ গুণে আর অ্যাল্‌বাট্রসের কান্না শুনতে শুনতে। ব্যর্থ বিপ্লবের বেদনার সঙ্গে ব্যক্তি-ব্যর্থতার সেই কান্না ইয়োরোপের সাহিত্যে-দর্শনে-সংগীতে নানা ভাবে প্রতিফলিত হল।

তবু এই ক্ষণদীপ্ত জীবনের মধ্যেও কীট্‌স্‌ সম্ভোগের আরতি করে গিয়েছিলেন। সেই দেহমন্ত্র কবি-দার্শনিক ব্রাউনিঙের হাতে প্রাণসাধনায় দীপ্ত হয়ে উঠল। রোম্যান্টিক্‌ অধ্যায় মোড় ফিরতে লাগল বুদ্ধিধর্মের দিকে। ওদিকে নবজাগ্রৎ আমেরিকার নতুন জীবন-বিশ্বাসে উজ্জ্বল হুইটম্যান দেহ আর মানবতার জয়গান শোনাতে লাগলেন।

মোহিতলালের পরিশীলিত কবি-মানসের মধ্যে এই তিনটি অধ্যায়ই প্রতিফলিত হয়েছে। উনিশ শতকের রোম্যান্টিক্ বেদনার সঙ্গে মিশেছে উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, হুইটম্যানের মানবমুখিনতার সঙ্গে ব্রাউনিঙের আধ্যাত্মিকতা, জীবন-সংবেদনশীল হয়েও জনসাধারণের প্রতি বায়রনীয় উচ্চনাসিকতা। সামগ্রিক বিচারে যদিও মোহিতলাল মুখ্যত দেহসাধনার কবি, কিন্তু লক্ষ্য করলেই তাঁর কবিতায় উল্লিখিত সব ক'টি বিশেষত্বেরই সন্ধান পাওয়া যাবে।

কিন্তু তাই বলে বাংলাদেশ এবং বাঙালি সংস্কৃতিও তাঁর কবিতায় উপেক্ষিত নয়। মোহিতলালের দেহবাদের নেপথ্যে তাদেরও স্পষ্ট প্রভাব আছে।

বাংলাদেশে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ভারতচন্দ্র যখন 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করলেন তখন সমস্ত জাতিরই অস্থিমজ্জায় ঘুণ ধরেছে। নবাবী আমলের ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়ে আছে কিন্তু ইংরেজী সংস্কৃতির বনিয়াদ পত্তন হয়নি। সামাজিক আর রাজনৈতিক জীবনের মতোই বাঙালির সংস্কৃতিও তখন 'নো ম্যান্স্ ল্যাণ্ড।' ধর্মসাহিত্যের অস্তিবাদ আর জাতির মনে প্রেরণা যোগায় না—তার জায়গা দখল করেছে স্থূলভ ফারশী কেচ্ছার লালাসিক্ততা। কলকাতায় ইংরেজের দপ্তর বসার পরেও সে যৌনতার ধারা রইল অব্যাহত ভাবে। কোম্পানির

দালালি করে হঠাৎ পাওয়া কাঁচা টাকার প্রাচুর্যে আসর জাঁকিয়ে বসল সদ্যোজাত 'বাবুর' দল, কদর্য খেউড় গান শুনে তারা বকৃশিস দিতে লাগল শাল-দোশালা। ছাপার যুগ আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হতে লাগল অসংখ্য প্রেমকাব্য —বীভৎস তার রুচি। বাবু আর বাইজীর কলকাতা ছেয়ে গেল 'রতিমঞ্জরী' আর 'স্ত্রী-পুলকন-দীপিকা'য়। লং সাহেবের মতে "These works are beastly equal to the worst of French School."

প্রতিক্রিয়া হতে দেরী হলনা। মিশনারী প্রভাবের ফলে যেমন ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হল, সেই সঙ্গে আপনা থেকেই এল রুচির বিশুদ্ধিতা। যুগের নেতৃত্ব নিলেন রামমোহন রায়। ওদিকে ঈশ্বর গুপ্ত কিংবা তাঁর শিষ্য দীনবন্ধু যদিও দু নৌকোয় অল্পবিস্তর পা রাখলেন—কিন্তু অভিজাত বঙ্কিম এলেন একেবারে খড়্গপাণি হয়ে, সাহিত্যের শুচিতা এবং শালীনতা রক্ষার জন্যে জীবনপণ করল "বঙ্গদর্শন।" মাত্রা এতদূর গড়ালো যে বলদেব পালিতের স্বচ্ছ সুন্দর দেহমূলক কবিতাকে পর্যন্ত বঙ্কিম নির্মম ভাষায় ধিক্কার দিলেন। ওদিকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ ব্রাহ্মেরাও দুর্নীতির বিরুদ্ধে নেমে পড়েছেন—সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য থেকে দেহও নির্বাসিত হল।

ফলে বাংলা সাহিত্যে দেহ-বিমুখিতাও চরমে পৌঁছুল। দেবেন্দ্রনাথ সেন দেহকামনার সংবাদ অবশ্য কিছু শুনিয়ে-

ছিলেন, ভাওয়ালের কবি গোবিন্দদাস লিখেছিলেন : "আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ।" কিন্তু মোটের ওপরে এগুলিকে নিছক সঞ্চারী ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। বঙ্কিমী শুচিতার শাসনে রোগ দূর হল বটে, কিন্তু রোগীও স্বাভাবিক হতে পারল না। বাংলা কবিতায় ভাবের ফানুস উড়তে লাগল—রক্ত মাংসের উত্তাপ আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

শেলীর সৌন্দর্যবাদ রবীন্দ্রনাথে এসে আরো ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে উঠল। কিন্তু তাঁর যৌবনের মাদকতা 'কড়ি ও কোমলে' প্রথম মুখর হয়ে উঠেই 'বিরহানন্দের' বানপ্রস্থে নীরব হয়ে গেল। বাংলা কবিতায় 'উর্বশী'র বন্দনায় ত্রুটি ঘটলনা, কিন্তু "বিকশিত বিশ্ববাসনার অরবিন্দে" "অতি লঘুভার পাদপদ্ম" ছাড়া কবির আর দাবি রইল না কোথাও।

মোহিতলাল যে-কালে দেখা দিলেন, রবীন্দ্রনাথ তখন মধ্যগগনে। বাঙালির শুচিবায়ু তখন এমন প্রবল হয়ে উঠেছে যে রবীন্দ্রনাথের নিতান্ত নিরীহ কবিতাতেও হিন্দু নীতিবাগীশ তখন দুর্নীতির সন্ধান পাচ্ছেন, এমন কি "শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা" কবিতাতেও নাকি আদিরসের উৎস মিলছে! দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ক্ষিপ্ত ধূর্জটির মতো রবীন্দ্রনাথের অশ্লীলতা প্রমাণে তৎপর। এই সময় মোহিতলাল দেখা দিলেন অসামান্য দুঃসাহসের সঙ্গে। হয়ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাছ থেকেই প্রত্যক্ষ প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন। গোবিন্দদাসের

প্রভাবও থাকতে পারে। অন্তত বাংলা সাহিত্যের নির্দেহ শুচিতা তাঁকে ক্লান্ত করে তুলেছিল নিশ্চয়ই।

'ভারতীর' পাতায় তখন ছন্দের টুং টাং আর পল্লীসুরের আসর বসেছে। মোহিতলাল এই আসরে বিপর্য্যয়ের মতো দেখা দিলেন। প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ক্ষুরধার ভাষার ঝলক তাঁর রচনাকে সহজেই বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র করে তুলল। রোমান্টিক্ আবেগকে বুদ্ধিবাদে এবং দার্শনিকতায় তিনি পরিশ্রুত করে নিলেন।

কিন্তু মোহিতলালের বিকাশ কখনও সম্পূর্ণ হত না— যদি তখন 'কল্লোল'-এর আবির্ভাব না হত। 'কল্লোল'-এর বিদ্রোহবাদকে মিশ্র রাগিণী বলাই সঙ্গত। উনিশ শতকের রোম্যান্টিক ব্যাকুলতার সঙ্গে তখন প্রথম যুদ্ধোত্তর হতাশার ঢেউ এসে মিশছে 'কল্লোল'-এর পাতায়। বাঙালি বুদ্ধিজীবীর দল তিক্ত রিক্ত জীবনজিজ্ঞাসায় নানা দিকে পরীক্ষাকার্য চালাচ্ছে তখন। বোদ্‌লেয়ার, ডি-এইচ্-লরেন্স থেকে কাউন্টি কালেন পর্যন্ত সকলের মধ্যে আশ্রয় খুঁজে ফিরছে তার মন। চারদিকের অনিশ্চিত নিরাশার ভেতরে সে কখনো অনুপ্রাণিত হচ্ছে ফ্রয়েডীয় দর্শনে, কখনো হুইটম্যানের পেশল দেহের বর্ণনায়। কখনো হাক্‌সলির কাছে সে প্রেরণা পাচ্ছে, কখনো সে গ্রহণ করছে লরেন্সের 'crystalization of sex!' কিন্তু সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের আত্মতৃপ্ত প্রশান্তির প্রতি সে খড়্গহস্ত—

দেহহীন প্রেমের আরতিকে আর সহ্য করতে পারছে না। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অপেক্ষাকৃত বাস্তব-সচেতন দুঃখবাদ তার মনের সঙ্গে খানিকটা সুর মিলিয়েছে, সে স্পর্ধাভরে জিজ্ঞাসা করছে—এ রকম লাইন কখনো লিখতে পারেন রবীন্দ্রনাথ ?

"তব জয় জয় চারিদিকে হয়, আলোক পাইল লোক,
শুধাই তোমায়—কী আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ ?
চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি-সাহারার বুকে ?"

যতীন্দ্রনাথের এই আক্রমণের লক্ষ্য কে, সেটা বুঝতে বেশি সময় লাগে না। অসীমের অভিসারে রবীন্দ্রনাথের যে কবিমন সঞ্চরণ করে ফিরছে, জীবনপঙ্কে নিবদ্ধচরণ তরুণেরা তার প্রতি শাণিত শর নিক্ষেপের দীক্ষা পেয়েছিল যতীন্দ্রনাথের কাছেই :

"অসীমেরে তুমি বাঁধিবে সীমায় অচেনারে লবে চিনে ;
নূতন নূতন কথার ছলনে মরণে লইবে জিনে।
দুঃখেরে তুমি দেবে না আমল, ভাবি' দেবতার দান ;
জীবনের এই কোলাহলে তুমি শুনিবে গভীর গান।
এ সবই রঙিন কথার বিম্ব, মিথ্যা আশায় ফাঁপা,
গভীর নিঠুর সত্যের পুর দিনে দিনে পড়ে চাপা—"

তাই 'জ্বালিয়া সত্য' দুঃখের নগ্নমূর্তিটিই দেখানোর ভার নিয়েছিলেন কল্লোল গোত্রীয় লেখকেরা।

এই "কল্লোল"-এ মোহিতলাল এলেন 'পান্থ'রূপে। 'পান্থ' কবিতায় তিনি সোপেনহাওয়েরের দুঃখবাদী জীবনদর্শনকে চ্যালেঞ্জ করলেন। নারীর রূপের মধ্যে সোপেনহাওয়ের ভীমা ভয়ঙ্করীকে দেখেছিলেন, মানুষের যৌন-কামনার মধ্যে দেখেছিলেন তার সত্তার অপমৃত্যু :

"The lovers are the traitors who seek to perpetuate the whole want and drudgery which could otherwise speedily reach an end,....here lies the profound reason for the shame connected with the process of generation"—(Durant)

যৌনকামনাকে পরিহার করো, নারীকে মনে করো পরিপূর্ণ একটি বিষপাত্র। জীবন-বিদ্বেষের এই চরম রূপ মোহিতলালের মনের মধ্যে যে ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জাগিয়ে তুলেছিল, তার অভিব্যক্তি ঘটল এই ভাবে :

"জীবনের দুঃখ সুখ বার বার ভুঞ্জিতে বাসনা—
অমৃত করেনা লুব্ধ, মরণেরে বাসি আমি ভালো!
যাতনার হাহারবে গাই গান, তৃষার্ত রসনা
বলে 'বন্ধু! উগ্র ওই সোমরস ঢালো, আরো ঢালো।'
তাই আমি রমণীর জায়ারূপ করি উপাসনা—
এই চোখে আরবার না নিবিতে গোধুলির আলো,
আমারি নূতন দেহে, ওগো সখি, জীবনের দীপখানি জ্বালো!"

সোপেনহাওয়েরের কাছে যা "Perpetual drudgery"

মোহিতলালের কাছে তাই হয়ে দাঁড়ালো অখণ্ড অফুরন্ত জীবনকামনা। 'কল্লোল'-এর মানসিকতা এই আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যে এসে যেন নিশ্চিন্তভাবে অবলম্বন করার মতো একটা ভিত্তির সন্ধান পেলো। মুহূর্তেই 'কল্লোল-এর "দ্রোণাচার্য" হয়ে উঠলেন মোহিতলাল।

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে 'কল্লোল'-এর নেতৃরূপে দেখা দিলেও মোহিতলাল কখনোই 'কল্লোল'-এর ছিলেন না। যে-কালের সাহিত্য এবং পরিবেশের মধ্যে মোহিতলালের কবি-মানস উন্মেষিত হয়েছিল, সে-কালের সঙ্গে 'কল্লোল'যুগের মৌলিক পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্য শুধু পরিমাণগতই ছিল না, তা গুণগতও বটে। আসলে মোহিতলালের কাব্য-ভাবনায় যে পরিমাণ ব্রাউনিং ছিলেন, সে পরিমাণে হুইটম্যান ছিলেন না। জীবনের ভোগবাদ তাঁর কাছে ছিল তত্ত্বগত—কবি তাকে আয়ত্ত করেছিলেন বুদ্ধির প্রেক্ষিতে। 'কল্লোল'-এর মধ্যে মধ্যবিত্ত সংসার থেকে বস্তিজীবন, এবং কয়লাখনি পর্যন্ত যে সাধারণীকরণ ঘটেছিল, বুদ্ধির আভিজাত্যগর্বী মোহিত-লালের সঙ্গে তার বিরোধেরই সম্বন্ধ ছিল, ঐক্যের নয়।

তবু মোহিতলাল যে 'কল্লোল'-এর অগ্রনায়ক হতে পেরেছিলেন, তার কারণ এই যে তাঁর কবিতায় অন্তত এমন একটা সুর শোনা গিয়েছিল যা রবীন্দ্রানুসরণ নয়, যার মধ্যে জীবন একটা নির্দিষ্ট আবেগের প্রশান্তিতে আত্মস্থ হয়ে যায়নি। সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার আঘাতে জর্জরিত জীবনকে তিনি

আকুল বাহু-বন্ধনে জড়িয়ে ধরেছিলেন উন্মত্ত প্রেমিকের মতো ঃ

"যত ব্যথা পাই, তত গান গাই—গাঁথি যে সুরের মালা।
ওগো সুন্দর ! নয়নে আমার নীল কাজলের জ্বালা।
আঁখি অনিমিখ্, মেটেনা পিপাসা, এ দেহ দহিতে চাই—"

শুধু দেহ-দাহন নয়, ভোগমন্ত্রে মোহিতলাল প্রায় অঘোর-পন্থী। জীবন যদি শ্মশানও হয়ে যায়, তবু সেই শ্মশানেই তাঁর শব-সাধনা, করোটির পাত্রে তাঁর বুক-জ্বালানো নেশার মত্ততা ঃ

"জীবন মধুর ! মরণ নিঠুর—তাহারে দলিব পা'য়,
যতদিন আছে মোহের মদিরা ধরণীর পেয়ালায়।
দেবতার মতো করো সুরাপান—
দূর হয়ে যাক হিতাহিত জ্ঞান !
আমরা বাজাব প্রলয় বিষাণ শম্ভুর মতো তুলি'—
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে, ধর মড়ার মাথার খুলি !"

'কল্লোল'-এর কাছে এই উন্মত্ত দেহানন্দ একটা দুর্বার আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল। 'দিল্-মিল্ মঞ্জিল, ভাঙ্গা ঘর 'সরা'য়ের, করে' তুলি রঙ্গিল্ আয় ভাই মুসাফের—' এমন দিল্‌খোলা আহ্বানে সাড়া না দিয়ে 'কল্লোল'-এর মুসাফেরদের উপায় ছিল না।

কিন্তু তবুও 'কল্লোল'-এর সঙ্গে মোহিতলালের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হল না। তার কারণ, শ্মশানই বলুন আর যাই

বলুন—পৃথিবী মোহিতলালের কাছে তার তরুলতা ফুল পল্লব নরনারী সব কিছু নিয়েই মধুমান্। রবীন্দ্রনাথ যে সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন, মোহিতলাল তাকেই দুই বাহুর মধ্যে টেনে আনতে চেয়েছিলেন সম্ভোগের আনন্দে: "Escape me? Never!" রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে ত্যাগের মধ্যে দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন আর মোহিতলাল চেয়েছিলেন তাকে ভোগের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে। "হে সংসার, হে লতা"র কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েও রবীন্দ্রনাথ অনন্ত প্রেমে যেমন তাকে জড়িয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, ভোগের সমস্ত তিক্ত বেদনার মধ্য দিয়েও মোহিতলালেরও দাবি ছিল তাই। সুতরাং বাইরে বৈসাদৃশ্য থাকলেও মোহিতলাল ছিলেন আসলে রবীন্দ্রনাথেরই শিষ্য, আমি অন্যত্র বলেছি, "দুর্বিনীত শিষ্য।"

আর 'কল্লোল'-এর কাছে জীবন তখন 'পোড়ো জমি।' সংস্কার ভাঙবে বলেই সে ভাঙতে এসেছে, তার কাছে জোলার ন্যাচারালিজম আর লরেন্সের দেহ-দর্শন একাকার। দেহ সম্ভোগ তার কাছে একান্তই জৈব ধর্ম: "শুধিলাম বিধাতার দেনা।" লেডী চ্যাটার্লির সংস্কারমুক্তি, সীমান্তের পাঠান সৈন্যের বলিষ্ঠ পৌরুষের কাছে ইংরেজ কন্যার মুগ্ধ দেহদান অথবা বস্তি কিংবা ভিখারীজীবনের আদিম লালসা, সবই তার কাছে সাহিত্যের রসায়ন হয়ে উঠছে। হুট্-হামসুনের ক্ষুধা এবং দেহকামনার সঙ্গে যাযাবরী বিশৃঙ্খল জীবন তার

পরম প্রলোভনের বস্তু। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই 'বেদে' মনোভাবকে ধিক্কার দিয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন "রিরংসার কারি পাউডার।"

অভিজাত মোহিতলাল দেহবাদের প্রবক্তা হয়েও এই কামবাদকে সহ্য করতে পারলেন না। তিনি যা চেয়েছিলেন, তা খুঁজে পেলেন না কল্লোলগোত্রীয় লেখকদের ভেতরে। মার্জিত পরিশীলিত মোহিতলাল স্বভাবতই সরে দাঁড়ালেন তাঁর অনুগামীদের কাছ থেকে—সত্যসুন্দর দাসের ভূমিকায় তাঁর একদা-শিষ্যদের বিরুদ্ধেই তিনি অস্ত্রধারণ করলেন। যিনি শুনিয়েছিলেন "পাপ কোথা নাই, গাহিয়াছে ঋষি অমৃতের সন্তান—" তিনিই শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করলেন পাপ মোচনের দুরূহ ব্রত।

বাইরে থেকে মোহিতলালের এই রূপান্তর বিস্ময়কর মনে হলেও এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা নেই। মোহিতলালের কাছে দেহকে আশ্রয় করে কাম সার্থক, আর কল্লোলীয়দের কাছে কামের জন্যই দেহ। সুতরাং বিরোধ ছিল সূচনাতেই। উত্তরকালে সাহিত্যের শুচিতা রক্ষায় যখন মোহিতলালকে অগ্রসর দেখতে পাই, তখন হঠাৎ চমক লাগলেও একটু তাকিয়ে দেখলেই আর অসঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না।

* * * * *

মোহিতলালকে অনেকটাই চেনা যাবে তাঁর রচনার আঙ্গিকের প্রতি লক্ষ্য রাখলে। দৃঢ়বদ্ধ কঠিন ভাষা—প্রতিটি

শব্দ প্রয়োগে সচেতন সংযম। শব্দ-ব্যবহারে এই সতর্ক আভিজাত্য রবীন্দ্রনাথেও নেই। আর সব মিলিয়ে যেন উগ্র একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, তাঁর ভাষা এবং বৈদগ্ধ্য সাধারণ পাঠককে সে-রচনার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

রচনার এই বহিরঙ্গ তাঁর কাব্যপাঠেরই সূচীপত্র। দেহের সাধক হয়েও মোহিতলালের অবস্থান জীবনের কাছ থেকে অনেক দূরে। আত্মময় কবি এখানেও রোম্যান্টিক যুগের সাধনায় তটস্থ। তাঁর মনের নেপথ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরই প্রেরণা।

মোহিতলাল শঙ্করচার্য্যকে ব্যঙ্গ করেছেন, বুদ্ধকে ধিক্কার জানিয়েছেন, "নারীস্তোত্রে" সৃষ্টি-শক্তির জয়গান গেয়েছেন। দেহ-অরণির মন্থনে অগ্নিকণা জ্বালিয়ে মদনের আরাধনা করতে চেয়েছেন তিনি, তবু কেন তাঁর মনে হয়ঃ "আমি যে বধূরে কোলে করে কাঁদি যত হেরি তার মুখ?" তার কারণ, মুখ্যত রোমান্টিক কবি এই দেহভোগকে কিছুতেই বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারেন নি। জীবনের সমগ্রতার ভেতরে মহত্তম সৌন্দর্যের যিনি সাধক, এই কামার্ততার মধ্যে তিনি ক্লান্তি আর বিষন্নতার দীর্ঘশ্বাসই ফেলেছেন।

আশ্চর্য এই, সোপেনহাওয়েরকে বিদ্রূপ করেও মোহিতলাল যেন কোথায় তাঁকে অনেকখানি মেনে নিয়েছেন। নারীর রূপ সম্বন্ধে সোপেনহাওয়ের বলেছিলেনঃ "With young girls, Nature···dowers them with a wealth of

beauty and is lavish in her gift of charm, at the expense of all the rest of their lives, so that during those years they may capture the fancy of some men—" (Ibid)

অর্থাৎ, নারী শুধুই সৃষ্টির উপায়ন—ফুল ফোটানো এবং ফল ধরানোই তার শেষ কথা। তার মন কিংবা আত্মার কল্পনা নিতান্তই অবান্তর, কারণ সে "incapable of taking a purely objective interest in anything!" কিন্তু সোপেনহাওয়েরের সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকেও মোহিতলাল প্রায় একই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন তাঁর 'নারী স্তোত্রে'। নারী বন্দনার সমস্ত উৎসাহ সত্ত্বেও পরোক্ষে এই কবিতায় নারী অস্বীকৃত। তার সৃষ্টি-প্রক্রিয়া এখানে যান্ত্রিক, সে নিতান্তই প্রকৃতির ধর্মমাত্র। তার আত্মার প্রসঙ্গ অনাবশ্যক ঃ

"দেহই অমৃতঘট—আত্মা তার ফেন অভিমান!
সেই দেহ তুচ্ছ করি' আত্মাভয়-বন্ধন-জর্জর
ফিরিছে প্রলয়পথে অভিশপ্ত প্রেতের সমান—
আত্মার নির্বাণতীর্থ নারীদেহে চায় তবু আত্মার সন্ধান।"

সুতরাং সম্ভোগ-উল্লাসের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মের দুর্বারতা স্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই নয়, "নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালোবেসে বক্ষে লই টানি!"

এই মনোভাবের পেছনে কাইজারলিঙের বায়োলজীর

সূত্র কাজ করছে। প্রকৃতির নিয়মের কাছে বাধ্যতামূলক আত্মসমর্পণের একটা পরাজয়ের বেদনাই উচ্চারিত হয়েছে এখানে। তাই শেষ পর্যন্ত "দেহের মাঝারে দেহাতীত ক্রন্দনই" মোহিতলালের ভালো লেগেছে। নিজের দেহকামনাকে নিজেই তিনি ধিক্কার দিয়েছেন "অ-মানুষ" নাম দিয়ে :

"আমি তোদের কেহই যে নই! দেহের আমার নেই যে ছায়া।
আমি যাহার আপন—তারো নেই যে আমার মতন কায়া!
নদীর ধারে ভাঙন যেথায়
ঘরখানি মোর বাঁধব সেথায়—
শ্মশান স্বপন বিভীষিকায় করবে আদর সে মোর জায়া
জনম জনম এমনি কাটে, ঘুচল নাতো ছায়ার মায়া!"

এই আত্মবিলাপ কেন? কেন তাঁকে বলতে হচ্ছে :

"পূজার প্রসাদ আমার লাগি আবার কেন থালায় ধরো?
ওগো আমার হাত ধোরোনা বন্ধু! প্রেমিক,
—সরো—সরো—?"

'নারী স্তোত্রে'র স্তুতির সঙ্গে এর যোগ আছে। এর মূল প্রসারিত রয়েছে শর্প্যার মেলোডির শূন্যতায়, 'ডন জুয়ানের ব্যঙ্গবাণীর ভেতরে; বিলাপের মধ্যে ব্যক্তিত্ববাদের কারুণ্যই প্রধান হয়ে বাজছে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত :

"ভোরের বেলায় বাদল নামিল যবে,
আঁখির ঝরণা দেখিল না কেহ

ধারা বরিষণে তিতিল যে দেহ,
শেষ ক্রন্দন ধ্বনিও তখন
ডুবিল মেঘের রবে,
তুই পথে দোঁহে ছাড়াছাড়ি হনু যবে !"

দেহভোগের ঘুরপথে গিয়েও শেষ পর্যন্ত মোহিতলাল যাত্রা সাঙ্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথে এসে, উনিশ শতকের রোম্যান্টিক্ বেদনাবাদে। দেহস্বরূপিনী হয়ে দাঁড়িয়েছেন "মানস লক্ষ্মী।" পৃথিবী এবং জীবনাসক্তিতে মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের সার্থক সহচর—সেখানে তাঁকে চিনতে কিছুমাত্র ভুল হয় না।

* * * *

তবু রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে মোহিতলালই অগ্রণী—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আধুনিক বাংলা কবিতায় ইন্টেলেক্টের দীপ্তিবিলাস আমরা মোহিতলালের কবিতাতেই প্রথম দেখতে পাই। 'ভারতী'র ক্লান্তিকর ভাষাবৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি সুরবৈচিত্র্যে বিশিষ্ট। অতীন্দ্রিয় শুচিবাদের ভেতর তিনি প্যাশনের উত্তাপ এনে দিয়েছেন—'কল্লোল'-এর স্বদলীয় না হলেও তিনি সেদিনের তরুণ বিদ্রোহীদের অগ্রনায়ক।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মোহিতলালের ব্যক্তি-চেতনার অতি-সজাগ অভিমান তাঁর কবিতাকে একটা সীমার মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখল। তাঁর পূর্বগামী রবীন্দ্রনাথ ধাপে ধাপে

যখন জনজীবনের নিকট-সন্নিধ্যে নেমে এলেন—তখনো মোহিতলাল তাঁর ব্যক্তিত্বের গণ্ডি ছেড়ে বাইরে আসতে পারলেন না। তাঁর 'ফর্মে' যে আত্মকেন্দ্রিক আভিজাত্য আছে তাঁর 'কন্‌টেন্টে'ও তাই। সেই জন্যই তাঁর কবিতায় দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের কোনো সজাগ চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর দু-একটি বিচ্ছিন্ন কবিতায় সমসাময়িক এক-আধটি রাজনৈতিক ঘটনার আভাস অবশ্য আছে, যেমন 'হেমন্ত গোধূলিতে' কোনো প্রায়োপবেশনব্রতী দেশ প্রেমিক যুবার প্রতি তাঁর "প্রশ্ন"। কিন্তু এই "প্রশ্নে"র মধ্যেও আত্মত্যাগী যুবককে তিনি কুণ্ঠাভরে জিজ্ঞাসা করছেন, তার এই ত্যাগে দেশ কি সত্যি সত্যিই উদ্বুদ্ধ হবে?

"এরূপ নেহারি স্বজাতি তোমার হবে কি জাতিস্মর?
আপনা চিনিবে? মরণে জিনিবে?—তাহারি অধীশ্বর
না হয়ে, শুধুই প্রান্তর-পথে করিবে না ছুটাছুটি
যত আলেয়ার আলোকের পিছে, জীবনে লইয়া ছুটি?
মৃত্যুই শুধু হবে না তো বড়? ভেবে দেখ, বলীয়ান্,
হে মোর দেশের যুবন্ প্রাণের প্রতীক মূর্তিমান!"

এখানেও ব্যক্তির সাধনাই কবির সশ্রদ্ধ অভিনন্দন পেয়েছে, "counting the noses" যে million, তার প্রতি কবির আস্থা ফুটে ওঠেনি। বিশুদ্ধ সাহিত্যের সাধক মোহিতলাল রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্যার স্বরূপকে কখনো সাহিত্যভাত করেননি। যেটুকু আছে তা

নিরঞ্জন—তার কোনো বিশেষ রূপ নেই। মোহিতলাল দাবি করেছিলেন, তাঁর "আমি" প্রবন্ধ (নব পর্যায় 'বঙ্গ দর্শনে' পুনর্মুদ্রিত) থেকে নজরুল "বিদ্রোহী" কবিতার উৎস পেয়েছেন। হতেও পারে। কিন্তু এই দুটি রচনাকে পাশাপাশি রাখলেই দুজনের মানসধর্মের পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে। "আমি"র মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চরম প্রকাশ, কিন্তু "বিদ্রোহী" অ্যানার্কিক্যাল্ হয়েও সামাজিক এবং রাজনৈতিক চৈতন্যে প্রবুদ্ধ। মোহিতলালের "অকালজলদ উদিয়াছে কাল কালাপাহাড়ে"র সঙ্গে "কোথা তৈমুর, কোথা চেঙ্গিস্ কোথায় কালাপাহাড়"-এর পার্থক্য ব্যাখ্যা করে বোঝাবার প্রয়োজন করে না।

অথচ যে-যুগের মধ্যে মোহিতলাল বাস করে গেছেন, সে-কালে রাজনৈতিক তরঙ্গের অভাব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ থেকে থেকে চমকে উঠেছেন, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণায়, মানুষের প্রতি অত্যাচারে তাঁর শান্ত লেখনীও ঘন ঘন বজ্রশিখায় জ্বলে উঠেছে। ছন্দযাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও তাঁর "ফুলের ফসলের" মধ্যে থেকে উৎকর্ণ হয়ে উঠছেন :

"নতুন খাতার বেদাগ পাতায়
স্বস্তিকে কে সিঁদুর দেবে ?
তৈরী থাকো—তরুণ উষায়
অরুণ জীবন আসবে নেবে।"

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কলমেও সমাজচেতনার স্পষ্ট অঙ্কুর

পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরেই সে-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভা মোহিতলাল বিস্ময়করভাবে নীরব। তাঁর "পুরুষ" যখন "কাল রাত্রি"র তপস্যায় বসেছে তখন সে তপস্যাও নিছক আত্মগত, সে শব-সাধনার উদ্দেশ্য ব্যক্তিক সিদ্ধি।

এর জন্যে তাঁর উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই দায়ী। আঙ্গিকের নিষেধের সাহায্যে তিনি বহু ক্ষেত্রেই সাধারণ পাঠককে তাঁর কবিতায় প্রবেশের অধিকার দেননি, আর এই কারণেই তাঁর কবিতাতেও সর্বজনীন ও কালীন সত্য নির্বাসিত। তাই যুগের অগ্রণী হয়েও কবি যুগের সঙ্গে এগিয়ে চলতে পারলেন না। সমস্ত উৎকর্ষ, সমস্ত স্বাতন্ত্র্য নিয়েও তার সৃষ্টি প্রধানভাবে অ্যাকাডেমিক হয়েই রইল। মোটামুটি দেহপ্রেমের একটা ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল আনন্দ ছাড়া মোহিতলালের জীবনদর্শন শেষ পর্যন্ত অ্যাবসট্রাক্‌শনেই পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্র-নাথের জীবনবোধ স্পষ্ট রেখায় উচ্চারিত; তা স্তরে স্তরে বিকসিত হয়েছে, কালের সঙ্গে পদক্ষেপ করতে পেরেছে সহজ সৎসাহসের সঙ্গে। কিন্তু মোহিতলাল নিজের মধ্যেই আবর্তিত হয়েছেন। কামনা-নির্বেদ-ক্লান্তি এবং রোমান্সের জট ছাড়িয়ে তার কোনো পরিণাম নিরূপণ করাই কঠিন। পরম বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে তাঁর প্রথম কাব্য "স্বপন-পশারী" থেকে শেষ কাব্য "হেমন্ত-গোধূলি" পর্যন্ত কোনো মানসিক ক্রমবিকাশের সন্ধান পাওয়া যায় না। যে-কোনো

বই থেকে একটি কবিতাকে তুলে নিয়ে অন্য বইতে সন্নিবেশ করা চলে—তাতে কোথাও কোনো স্বরচ্যুতি ধরা পড়বে না। মনঃপ্রকর্ষের উচ্চমঞ্চে সে "সংকীর্ণ বাতায়নে" তিনি বসে ছিলেন, সেখান থেকে জীবনের একটি মাত্র দিককেই তিনি দেখে গেলেন—গতির বহুবিচিত্র আনন্দে তা সহস্রধারায় উচ্ছলিত হল না।

মোহিতলাল বাঙালি পাঠকের কাছে সুবিচার পাননি—এ অভিযোগ আছে। তার জন্যে কবির দায়িত্বও কিছু রয়েছে। আত্মপ্রত্যয় বড় জিনিস নিঃসন্দেহ, তবু তারও মাত্রা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন স্বীকার্য। সাধারণের প্রতি অবিশ্বাসে শেষ পর্যন্ত নিজেকেই সংকীর্ণ করে ফেলতে হয়—মোহিতলালেও তাই ঘটেছে। তাঁর অ্যাকাডেমিক কবিতার টীকা-ভাষ্য পণ্ডিতেরা করবেন, কিন্তু বুদ্ধির আভিজাত্যের জন্য তা কোনোদিন জনসাধারণের অকুণ্ঠ সংবর্ধনা পাবে কিনা, সে সম্বন্ধে সঙ্গত সন্দেহ আছে।

তাঁর "কাল-বৈশাখী" পড়তে গিয়ে শেলীর "West Wind" মনে পড়ছে:

"এত যে ভীষণ, তবু তারে হেরি' ধরার ধরেনা হর্ষ,
ওরি মাঝে আছে কালপুরুষের সুগভীর পরামর্শ।
নীল-অঞ্জন-গিরিনিভ কায়া,
নিশীথ-নীরব ঘন-ঘোর ছায়া—
ওরি মাঝে আছে নব-বিধানের আশ্বাস দুর্ধর্ষ"—

"নববিধানে"র কথা তো কবি ভেবেছেন। গভীর ক্ষোভের সঙ্গে প্রশ্ন জাগছে : তা হলে কেন এই "নববিধানে"র কথা তিনি আরো কিছু আমাদের বলে গেলেন না ? শেলীর "ওয়েস্ট্ উইণ্ড" পর্যন্তই যদি তিনি এসেছিলেন, তা হলে "ওড টু লিবার্টি" কি আর খুব বেশি দূরে ছিল ?*

* উত্তরকালে প্রাবন্ধিক মোহিতলাল বিবেকানন্দ, হিন্দুত্ব এবং সুভাষচন্দ্রের গুণগ্রাহী হয়েছিলেন। কিন্তু সে আলোচনা এ প্রসঙ্গের অন্তর্গত নয়।

জীবনানন্দ দাশ

জীবনানন্দ বাঙলা কাব্যে অনন্য—এই একটি ছাড়া কী আর বলা যায় তাঁর সম্পর্কে? পর্যাপ্ত না হোক, তাঁর কবিতা নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা পণ্ডিত আর বিদগ্ধজনেরা করেছেন। যতদূর জানি, ব্যক্তিগতভাবে কবি এইসব আলোচনার কোনটিকেই নিজের কাব্যের প্রামাণ্য ভাষ্য বলে মেনে নেননি। জীবনানন্দ 'নির্জন' বা 'নির্জনতম' কবি, তাঁর লেখা 'সিম্বলিক্' কিংবা 'সুররিয়্যালিষ্ট'—এ সব নিয়ে যতই মতভেদ থাক, কবির বক্তব্যঃ এরা 'প্রায় সবই আংশিক ভাবে সত্য—কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো অধ্যায় সম্পর্কে খাটে—সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।" অতএব "কবিতাসৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুই-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিমনের ব্যাপার; কাজেই পাঠক ও সমালোচকের উপলব্ধিতে এত তারতম্য।" [শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকা]

তাহলে জীবনানন্দের কাব্য-ব্যাখ্যায় সমালোচকের যত সংকটই ঘটুক, পাঠকের ভূমিকা নিরাপদ। রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, 'কবিতা বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।' কথাটা নিয়ে তর্কের ঝড় উঠতে পারে। কিন্তু পাঠক হিসাবে আমার মনে হয়, এই উক্তিটি আধুনিক বাংলা

কাব্যে জীবনানন্দ সম্পর্কে যতটা প্রযোজ্য, এমন আর কারো সম্বন্ধেই নয়।

সাহিত্যে জীবনানন্দের আসন কোথায়—এ বিচার বর্তমানে সহজ নয়। যে-কোনো সমকালীনেরই মূল্যবিচার জটিল ব্যাপার, 'সাতটি তারার তিমির' বা 'মহাপৃথিবী'র কবির ক্ষেত্রে তা জটিলতম। দীর্ঘদিন ধরে তা বিতর্কের বিষয় হয়ে থাকবে। কবির ইচ্ছে ছিল একদা নিজ কাব্যের কুঞ্চিকা তিনি পাঠকের হাতে তুলে দেবেন; কিন্তু তাঁর আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যু সেই সুযোগ থেকে বাংলা দেশকে বঞ্চিত করল। আপাতত আমরা যারা পাঠক, তারা তাঁর কাব্য সম্পর্কে একটি কথাই বলতে পারি। তিনি অনন্য।

লক্ষ্য করবার মতো, রবীন্দ্রোত্তর কালের বাংলা কাব্যে তাঁর মতো কেউই প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। এমন কি, যাঁরা সাম্যবাদী কবি, তীক্ষ্ণ স্পষ্টতায় যাঁরা কাব্যকে সর্বদা সজাগ করে রাখতে চান, তাঁদের ওপরেও জীবনানন্দের 'ইমেজিজম্' আর দূরান্বয়ী বাগ্‌ভঙ্গির ছায়া পড়েছে। অন্যদিকে তাঁর প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ শিষ্যও অনেক রয়েছেন। তথাপি জীবনানন্দ একান্ত ভাবে একক। তিনি অনুকৃত হয়েছেন, কিন্তু অনুসৃত হতে পারেন নি। তাঁর যে-হৃদয় 'হাওয়ার রাতে' 'নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে', যাকে মনে হল 'একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে

তারায় তারায় উড়িয়ে নিয়ে চললো একটা দুরন্ত শকুনের মতো'—সে-হৃদয়ের অনুসরণ সহজ নয়। কারো পক্ষেই তা সম্ভব বলে মনে হয় না।

বহিরঙ্গের দিক থেকে জীবনানন্দের একটা নিজস্ব আঙ্গিক আছে। সে-আঙ্গিক অসামান্য মৌলিক। এ-কথা বললে অন্যায় হয় না, তাঁর কাব্য-বিচারের [এবং আস্বাদনেরও] প্রচেষ্টা অনেক সময় এই বাইরের কাঠামোতে এসেই থমকে গেছে। তাঁর খ্যাতি-অখ্যাতি অনেকখানিই নিরূপিত হয়েছে এই বহিরঙ্গের ওপরে। জীবনানন্দের আঙ্গিককে আয়ত্ত করা তাঁর কাব্যপ্রবেশের প্রথম পাঠ।

সেই পাঠের পরে আসে তাঁর মন আর মননকে বোঝার পালা। এ কাজ আরো কঠিন। তার কারণ, বাঙলা সাহিত্যে জীবনানন্দের কবিতা সবচেয়ে আত্মগত। বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রাথমিক প্রয়াসের পরে জীবনানন্দের মধ্যে এই ধারার প্রধানতম প্রকাশ।

'লিরিক' কবিতামাত্রেই স্বগতোক্তি। তবু সাবধানী কবি মঞ্চের অভিনেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর শিল্পীসত্তাকে দ্বিধাবিভক্ত করে রাখতে হয়। তন্ময় চিত্তে অভিনয় করবার সময়েও তিনি তাঁর দর্শকদের ভুলতে পারেন না। কোন্ দৃশ্যে কোথায় হাততালি পাওয়া যাবে, অভিনেতা এ সম্বন্ধে যেমন

অবহিত থাকেন, তেমনি কবিও জানেন, কোন্ কৌশলে তাঁর পাঠকের আবেগকে তিনি সহজেই আলোড়িত করতে পারেন ; ভাষায়, ব্যঞ্জনায়, চিত্র-কল্পনায় কোথায় তাঁর ঐন্দ্রজালিক কৃতি, সে-সম্পর্কেও তিনি সচেতন।

কিন্তু যিনি নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ, যাঁর কবিতা একান্ত-ভাবে নিজের জন্যেই, তাঁর সঙ্গে ভাবসাযুজ্য স্বভাবতই আয়াসলভ্য। বোধের চাইতে সহমর্মিতার আশ্রয়ই সেখানে নির্ভরযোগ্য। জীবনানন্দের কবিতাকে আস্বাদন করতে গেলে [সবটা করা সম্ভব কিনা জানি না] এই সহমর্মিতাই একমাত্র পথ। বাঙলা সাহিত্যে তিনি সবচেয়ে ব্যক্তিগত কবি। সুতরাং সমালোচকের মিতিবিদ্যা যতই উদ্ভ্রান্ত হোক, অন্তত পাঠক অন্তর-যোজনার উপায়নে জীবনানন্দের কাছে অনেকখানি অগ্রসর হতে পারেন। যে-কোনো কবিকেই সমালোচকের চেয়ে পাঠকের ওপর বেশি নির্ভর করতে হয়—জীবনানন্দ সম্বন্ধে সেটা সর্বাধিক সত্য।

জীবনানন্দ প্রকৃতির কবি। এই প্রকৃতি মহাপার্থিব। এর এক দিকে ঃ

নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার-বার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে ;
বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে ;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে।

এখানে অকৃত্রিম বাংলা দেশের অন্তরঙ্গ গন্ধ-স্পর্শ,

আমাদের সহজ পরিচিতির নম্র নিবিড় নৈকট্য। আবার অন্যত্র :

হাজার বছর খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো :
চারিদিকে পিরামিড—কাফনের ঘ্রাণ ;
বালির উপরে জ্যোৎস্না—খেজুর-ছায়ারা ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো : এশিরিয়—
দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।

বাংলাদেশের পাড়াগাঁর গা থেকে যেমন তিনি পান "রূপশালী-ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ," অন্যদিকে 'বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন, উরের আরশি থেকে ফেঁসে' তাঁর মানস-নাবিকের যাত্রা চলে 'বৈশালির থেকে বায়ু—গেৎসিমানি-আলেকজান্দ্রিয়ার মোমের আলোকগুলো' পর্যন্ত।

জীবনানন্দের এই প্রকৃতি-চারণার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক জগতে কোথাও কোনো কালের যতিচিহ্ন নেই। হাজার হাজার বছরের পুরোনো অতীত আর এই মুহূর্তের অন্তরঙ্গ বর্তমান একটি অখণ্ড সময়ের বৃত্তে ধরা পড়েছে। তাই তাঁর কল্পনার স্বচ্ছন্দচর্যা সীমানাহীন সময়ের মধ্যে প্রসারিত।

এই কালহীন কালের প্রতীক হিসেবে তিনি নিয়েছেন প্রান্তরকে—প্রধানত হেমন্তের প্রান্তরকে। কার্তিকের মৃদু-কুয়াশামাখা জ্যোৎস্নাভরা মাঠ তাঁর এই দূরাস্তীর্ণ কল্পনাকে

চঞ্চল করে তুলেছে সবচেয়ে বেশি। 'সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের' একটি মানুষকে নিয়ে গেছে লাসকাটা ঘরে ; যখন 'হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে', তখন অপেক্ষাতুর হৃদয় ভেবেছে, 'হে নাবিক, হে নাবিক, জীবন অপরিমেয় বাকী।' কার্তিকের জ্যোৎস্নায় কয়েকটি মাঠে-চরা ঘোড়া কবির মনকে আশ্চর্যভাবে সঞ্চারিত করেছে সময়হীন সময়ের প্রান্তরে ঃ

মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায়
কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে,
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে।

'এই সব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে' জীবনানন্দের মানসিক মুক্তি। রবীন্দ্রনাথকে যদি বর্ষা আর নদীর কবি বলা যায়, তাহলে জীবনানন্দ হেমন্ত আর প্রান্তরের কবি। মৃদু ধূমল জ্যোৎস্না—দিকচিহ্নহীন মাঠ এক অপূর্ব জাগর-স্বপ্ন সৃষ্টি করে তাঁর মনে—এক বিচিত্র সুর্-রিয়্যালিজমের মধ্যে তাঁর কল্পনাকে মগ্ন করে।

এই কল্পনার অনুষঙ্গী 'বাঁশপাতা—মরা ঘাস—আকাশের তারা।' 'কার্তিক কি অঘ্রাণের রাত্রির দুপুরে' 'হলুদ পাতার ভিড়ে বসে' 'মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে' প্রহর জাগে পাখি। ইঁদুর আর পেঁচারা এই হেমন্তের জ্যোৎস্নাতেই তাদের শিকার খুঁজে বেড়ায়।

জীবনানন্দ রোম্যান্টিক কবি। এই রোমান্টিক মন হৈমন্তী-চন্দ্রালোকের রহস্যে মিস্টিকের মতো সমাহিত। আর সে-রহস্যকে জানবার চাইতেও আস্বাদ করবার আনন্দ তাঁর নিবিড়তর। নির্জন নৈঃশব্দ্যের মধ্যে তাঁর অতর্ক অপ্রশ্ন আত্মলীনতা। হেমন্তের রাত্রে যখন বুনো হাঁস পাখা মেলে দেয়—'জলা মাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আহ্বানে,' তখন কবিরও সেই স্মৃতির জ্যোৎস্নায় সানন্দ অভিসার ঃ

মনে পড়ে কবেকার গাড়া গাঁর অরুণিমা সান্ন্যালের মুখ ;
উড়ুক উড়ুক তা'রা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক
কল্পনার হাঁস সব ; পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং মুছে গেল পর
উড়ুক উড়ুক তা'রা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

এই হেমন্ত জ্যোৎস্নাতেই 'বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা' শঙ্খমালার আবির্ভাব। যে-বনলতা সেন জীবনে একবার, মাত্র একবারের জন্যেই চকিত-প্রেক্ষণে অন্তরকে উদ্ভাসিত করে, এ সেই ক্ষণচারিণী মনোলালিতা ঃ

চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার ;
স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র—কবেকার শঙ্খিনীমালার ;
এ পৃথিবী একবার পায় তারে—পায়নাকো আর।

প্রধানত জীবনানন্দের সুর বিষণ্ণতার আমেজ-মাখানো—রোম্যান্টিক অনুভাবনার মৃদুস্বাদী বেদনায় সিক্ত। নগ্ন-নিষ্ঠুর

কর্মক্ষুব্ধ সংসার থেকে তাঁর স্বভাবতই অপসরণ। এক গভীরতর, নিবিড়তর সমাধান জীবনের কোথাও আছে—সমস্ত জিজ্ঞাসা যেখানে তিমির-স্তব্ধ ; যেখানে কোনো এক বোধ—কোনো এক স্বাদ আছে—যা 'অগাধ—অগাধ।' সেই অগাধ স্বাদের সাধনাই জীবনানন্দের কবিতার মর্মতত্ত্ব।

যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংস ফলিয়াছে
নষ্ট শসা—পচা চালকুম্‌ড়ার ছাঁচে,
যে-সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেই সব

দুঃসহ পরাভূত বিকৃতির মধ্যে কবি এই অগাধ গভীর স্বাদের সঞ্জীবন সন্ধান করেছেন। এই স্বাদ তাঁকে প্রকৃতিই দিতে পেরেছে কিছু পরিমাণে। মেঠো পথ, ধানসিড়ি, হেমন্তের ধান, রোদের নরম রং শিশুর গালের মত লাল, আইবুড়ো পাড়া গাঁর মেয়েদের নাচ—এই আদিম প্রাকৃতিক সারল্যে কবি যেন জীবনের জটিলতার গ্রন্থ মোচন করতে পেরেছেন :

রোধ—অবরোধ-ক্লেশ—কোলাহল শুনিবার নাহিকো সময়,
জানিতে চাই না আর সম্রাট সেজেছে ভাঁড় কোন্‌খানে—
কোথায় নতুন ক'রে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয় ;
আমার চোখের পাশে আনিও না সৈন্যদের মশালের
আগুনের রং

তার চাইতে ভালো উদ্যমহীন, উৎসাহহীন আত্মলুপ্তি। হেমন্তের ক্ষেতে চৈতালি আলোয় কিংবা 'পেঁচার পাখার

মতো অন্ধকারে' নিজের সমস্ত জাগরসত্তা নিঃশেষিত হোক :

গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে।
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেক দিন—
জেগে থেকে ঘুমোবার সাধ ভালোবেসে।

তবুও সে-সাধ সহজে মেটার নয়। সেই অগাধ-গভীর স্বাদের সাধনা কী নির্মমভাবে বিঘ্নিত! দক্ষিণের হাওয়ায়, 'জ্যেৎস্নার শরীরের স্বাদ'-মাখা চৈত্র-রাত্রিতে, হরিণ-হরিণীর মিলন-মুহূর্তে সাড়া দেয় শিকারীর বন্দুক। খাবার ডিশে মৃতহরিণের মাংসের ঘ্রাণ। জীবনের এই সিম্বলিক ট্র্যাজেডী তাই তাঁকে বার বার ডেকেছে সেই ধানকাটা মাঠে—যেখানে একটি মানুষ নিবিড়-নিদ্রিত শান্তিতে একান্ত :

শান্তি তবু: গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।

এই ক্লান্তি আর বেদনার পীড়নেই কবি খুঁজেছেন 'মস্ত বড়ো ময়দান—দেবদারু পামের নিবিড় মাথা—মাইলের পরে মাইল।' তিনি হৃদয়ে অনুভব করেছেন সেই দুপুরের বিশ্রান্ত বাতাসকে—যা 'খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে—গান গায়—গান গায়।' আশ্চর্য মৌলিক চিত্র-রচনায়, ভাষার কোমল কারুশিল্পে জীবনানন্দ এক ঐন্দ্রজালিক বিরামলোক লাভ করেছেন তাঁর কাব্যে। আমাদের ঘাত-জর্জর দৈনন্দিনতায়, আমাদের রক্তঝরা প্রহর-

পরিক্রমায়, আমাদের অশান্ত মনের উগ্রতায় আর অবদমনে তাঁর কাব্য এক মাধুর্যস্নিগ্ধ মরূদ্যান, কোনো রাত্রির হ্রদে শীতল অবগাহন। বিরাট পৃথিবী চলেছে অনন্তকালের নিরবধি পথ দিয়ে, কত সুসা-নিনেভ-গ্রীক্-হিন্দু-ফিনিশীয় সভ্যতার সমাধি-স্তূপ পার হয়ে, কত বিম্বিসার-আটিলার কীর্তি-অকীর্তির স্মৃতির ধূসর পাণ্ডুলিপি বহন করে'। কী ক্লান্ত, কী সুদুর্বহ এই পথচলা! তার চেয়ে সবকিছুর ওপর চিরবিরামের যতিপতন ঘটুক—আসুক অন্ধকার—যেখানে ভূগোলের রেখাজটিলতা নিঃশেষ লুপ্ত—যেখানে কালের কল্লোল সীমাহীন সময়ের তমসা-সমুদ্রে নিলীন!

> গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত ;
> আমাকে কেন জাগাতে চাও ?
> হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম-হাওয়া, আমাকে জাগাতে চাও কেন।

'ধানসিড়ি নদীর কিনারে' চিরনিদ্রার পৌষের রাত্রিই তবে আসন্ন হোক। আসুক তা হলে চিরকালের স্বপ্ননিবিড়তার সেই সঙ্গিনী :

> সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন ;
> থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।'

জীবনানন্দের কাব্যের উত্তর-পর্বে আর একটি সঞ্চারী সুর এসেছিল। যে-কোনো শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক্ কবির মতোই এই রক্তকলঙ্কিত কাল—যুদ্ধ আর মৃত্যুর প্রেতলীলা—তাঁকে জীবনের প্রেমে চকিত করে তুলেছিল। আত্মবৃত্ত কবি সহসা এক মহাপৃথিবীর মহত্তম প্রার্থনায় উঠেছিলেন উদ্দীপ্ত হয়ে। তাঁর সুরে এসেছিল 'তিমিরহননের গান'—এসেছিল 'সূর্যতামসী'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জীবনানন্দের কবিতায় এক মহৎ সূর্যের বাণী এনে দিয়েছিল। 'হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক' থেকে নিজের 'তিমির-বিলাসী' সত্তাকে তিনি 'তিমির-বিনাশী' শক্তিতে চেয়েছিলেন প্রাণিত করতে। এই নবলব্ধ চৈতন্য তাঁকে উত্তীর্ণ করেছিল এক সুবিপুল বোধির মধ্যে। ইতিহাসের গতি আজো শেষ হয়নি, মানুষ বহু মত, বহু প্রজ্ঞা, বহু ধর্মনায়ক আর রাষ্ট্রনায়কের অনুগমন করে চলেছে কাল-কালান্ত ধরে। সে হয়তো অনেক পেয়েছে, তবু কি সব পাওয়া হয়েছে তার? কোথাও কি দেখা দিয়েছে 'অনির্বচনীয় স্বপনের সফলতা—নবীনতা—শুভ্র মানবিকতার ভোর'? কবি তার উত্তর পান নি। তবু সমস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের অবসানে, মানুষের সমস্ত পরীক্ষা আর পরিক্রমা শেষ হয়ে গেলে, এক নিবিড় পরিচয়ে, কোনো এক সর্বপ্লাবী আনন্দের মধ্যে জীবন আর কাল কি অবলীন হয়ে যাবে না? সেই প্রত্যাশিত আগামী-সম্ভবের অভিমুখে জীবনানন্দের এই বন্দনা মন্ত্রোচ্চারের মতোই অনুপম :

নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের
চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হ'য়ে তবু ইতিহাস ভুবনে নবীন
হবে না কি মানুষকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট
বসন্তের তরে।
সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই
বোধির ভিতরে,
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি মানুষের বিষয় হৃদয় ;
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ ঃ হুতোম প্যাঁচার নক্সা

॥ ১ ॥

যাঁদের অকাল মৃত্যুতে বাঙলা সাহিত্য সব চাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাঁদের ভেতরে সর্ব প্রথমেই মনে পড়ে কালীপ্রসন্ন সিংহের কথা। আর শুধু বাঙলা সাহিত্য কেন, বাঙালির রেনেসাঁর ইতিহাসও এ ক্ষতি অপরিসীম। ১৮৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর জন্ম হয়, ১৮৭০ সালের জুলাই মাসে পরম শোকাবহ অকাল মৃত্যু ঘটে। মাত্র ত্রিশ বৎসরের এই সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিধির মধ্যে কালীপ্রসন্ন বাঙালি জাতি এবং বাঙলা সাহিত্যের জন্যে যে সাধনা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, তার তুলনা হয়না।

জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত দেওয়ান বংশের একমাত্র পুত্র কালীপ্রসন্ন। জন্মেছিলেন অফুরন্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে। পিতৃ-বিয়োগ ঘটে শৈশবে এবং কৈশোরেই বিপুল পৈতৃক বিত্ত-সম্ভার এসে পৌঁছোয় হাতের মুঠোতে। অতএব বাবুতন্ত্রের কলকাতায়—তখনকার প্রথা অনুযায়ী অধঃপতনের পথ কালীপ্রসন্নের পক্ষে অতিশয় সুগম ছিল। একদিকে পুতুল-নাচ, বাঈনাচ এবং গণিকা চর্চার বনেদী বাবুয়ানা, অন্যদিকে মদ্যপান এবং চলনে-বলনে-লেখনে বিকৃত ইংরেজিয়ানা

(কখনো কখনো ছদ্ম ব্রাহ্মিকতাও)—গ্রীক পুরাণের য়ুলিসিসের মতো এই শিলা এবং ক্যারিব্ডিসের মধ্য দিয়ে আশ্চর্য শক্তির সাহায্যে একটি খাঁটি মানুষ হয়ে তরী পার করেছিলেন কালীপ্রসন্ন। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের আদর্শ সে-যুগে একমাত্র কালীপ্রসন্নের মধ্যেই সার্থকভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে।

বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির অপূর্ব সমন্বয় হয়েছিল কালীপ্রসন্নের জীবনে। ঊনবিংশ শতকের পূর্ণ প্রগতিশীলতার প্রতিনিধি তিনি। জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি কী অপরিসীম শ্রদ্ধা যে তাঁর ছিল—তার উজ্জ্বলতম অভিজ্ঞান হল বহু ব্যয়সাধ্য "মহাভারতের" বিপুল অনুবাদ। বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে তখনকার সমস্ত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এই বিরাট কাজে তাঁর সহযোগিতা করেছিলেন। মাত্র এই "মহাভারতের" জন্যেই কালীপ্রসন্ন বাঙালির কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। কিন্তু কেবল ঐতিহ্যচর্চার মধ্যেই তাঁর কর্তব্য শেষ হয়নি। রামমোহনের প্রভাবের ফলে সমকালীন সমাজের যা কিছু কুপ্রথা—যা কিছু গ্লানি—যত কিছু ভণ্ডামি—তাদের সকলের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন। বিদ্রোহী কালীপ্রসন্নের একটি বিচিত্র কীর্তি তাঁর "টিকি মিউজিয়াম।" তথাকথিত ভট্টাচার্য পণ্ডিতদের ধর্মপ্রাণতা যে কী পরিমাণে অন্তঃসার বিবর্জিত, সেইটি প্রমাণ করবার জন্যে অর্থমূল্যের বিনিময়ে তিনি তাদের টিকি কেটে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।

এমন মর্মভেদী 'Practical joke'-এর দৃষ্টান্ত বাংলা দেশে খুব বেশি দেখতে পাওয়া যায়না। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'টিকিমেধ যজ্ঞ' কবিতায় কালীপ্রসন্নকে এইভাবে অভিনন্দিত করেছেন ঃ

'সমাচ্ছন্ন টিকির প্রতাপে
অর্ধধরা, ব্যাখ্যা হৈল "অহো! টিকি কিনা বৈদ্যুতিকী।"
সেই পুচ্ছ আধ্যাত্মিকী···সেই টিকি···কালো ঝিকিমিকি
নির্মূল করিল সিংহ,—তার রৌপ্য কাঁচিটির চাপে।
সর্পযজ্ঞে জন্মেজয় পোড়াইল যথা লক্ষ সাপে,—
টিকিমেধ যজ্ঞে তার,···নষ্ট হৈল সর্পসম ফুঁসি
বাহিরে দেখায়ে রোষ,—মনে মনে মূল্য পেয়ে ফুসী
টিকির মালিক যত।···শশব্যস্ত টিকি অন্তর্ধান;
কলিযুগে কালী সিংহ উদ্ধারিল দেবতার মান।"

এই 'শিখামেধ' যজ্ঞের পেছনে কালীপ্রসন্নের যে মনোভঙ্গি নিহিত ছিল—"হুতোম প্যাঁচার নক্সা" তারই অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি।

কালীপ্রসন্নের সৎকীর্তি এবং সহৃদয়তার তালিকা অফুরন্ত। মাত্র তেরো বৎসর বয়েসে যিনি 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র প্রতিজ্ঞা করে সুসাহিত্যসৃষ্টি এবং সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন; প্রগতিশীল নাট্যধারার প্রবর্তনের জন্যে যিনি গড়ে তুলেছিলেন 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' এবং নাটক রচনাও করেছিলেন তার সঙ্গে; 'মেঘনাদ বধের'

কবিকে প্রথম গণ-সংবর্ধনা জানিয়ে যিনি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন কৃতজ্ঞ বাঙালির মানপত্র এবং প্রীতির মানপত্র; কুখ্যাত "নীলদর্পণের" মোকর্দমায় রেভারেণ্ড লঙের জরিমানার হাজার টাকা বেরিয়ে এসেছিল যাঁর তেজস্বী মুষ্টি থেকে; নীলকরদের শয়তানী চক্রান্তে জর্জরিত "হিন্দু পেট্রিয়টের" লোকান্তরিত হরিশ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারকে যাঁর উদার অর্থসাহায্যই বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল—সেই কালীপ্রসন্ন সিংহের ঋণ বাঙালি কোনোদিনই পরিশোধ করতে পারবেনা। এ-ছাড়াও সংবাদপত্র সেবায়, দানে-দাক্ষিণ্যে, দেশপ্রেমে, শিক্ষার আনুকূল্যে—এমনকি নিজব্যয়ে কলকাতায় প্রথম বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রবর্তনে—এক কথায় সমসাময়িক জীবনের সমস্ত প্রগতিশীল ভূমিকাতেই আমরা কালীপ্রসন্নকে দেখতে পেয়েছিলাম। এই বিরাট মানুষটির অপূর্ব জীবনসাধনার পরিচয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত জীবনীগ্রন্থটিতে সবিস্তারে পাওয়া যাবে।

আমরা সত্যিই আত্মবিস্মৃত। তা না হলে বৎসরে অন্তত একবারও তাঁর স্মরণোৎসবের আয়োজন করে নিজেরাই চরিতার্থ হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করতাম। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির 'রেনেসাঁসের' অন্যতম দীপ্তিমান নক্ষত্র কালীপ্রসন্ন সিংহকে ভুলে যাওয়ার দুর্ভাগ্য আমাদের পরমতম লজ্জার বস্তু!

॥ ২ ॥

কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা' দ্বিতীয়রহিত সমাজচিত্র। শুধু চিত্র বললে ঠিক হয়না—বইটি আসলে চিত্রশালা—'পিক্‌চার গ্যালারী।' চড়ক-পার্বণের রঙ্গ, বারোয়ারীর নামে সামাজিক দুর্নীতি, মরাফেরা, ছেলেধরা, মিউটিনি, সাতপেয়ে গোরু আর দরিয়াই ঘোড়ার বিচিত্র হুজুকের ব্যঙ্গ-প্রসঙ্গ; নানারকম বুজরুকির নমুনা, হঠাৎ অবতার বাবু পদ্মলোচন দত্তের শ্লেষতিক্ত উপাখ্যান, মাহেশের স্নানযাত্রার বর্ণনা, রামলীলার হট্ট-উৎসব এবং নব-প্রবর্তিত রেলওয়ের অতি বাস্তব বিবরণী—হুতোমের নক্‌সা থেকে এরা কেউই বর্জিত হয়নি। শুধু বিশুদ্ধ সমাজচিত্র নয়—সংস্কার-ব্রতীর উপদেশও নয়—রসসৃষ্টি হিসেবেও নক্‌সার উৎকর্ষ অসামান্য; বইটি উপন্যাসের চাইতেও সুখপাঠ্য। এমন একটি উপাদেয় গ্রন্থের সঙ্গে সচরাচর আমাদের পরিচয় ঘটেনা।

'নক্‌সা' অবশ্য এই পর্যায়ের প্রথম বই নয়। সমাজ-জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ভ্রান্তি-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম উল্লেখযোগ্যভাবে লেখনী ধরেছিলেন 'সমাচার চন্দ্রিকা'র বিশ্রুতনামা সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বাবুর উপাখ্যানে' তার আরম্ভ এবং পরিণতি যথাক্রমে 'কলিকাতা কমলালয়', 'নব বাবুবিলাস' এবং 'নব বিবিবিলাস'-এর মধ্যে। সেকালে কলকাতার সমাজক্ষেত্রে, বিশেষত নব্য-

তন্ত্রীদের ভেতরে যে-সব অসঙ্গতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছিল, ভবানীচরণের ক্রোধাগ্নির লক্ষ্য ছিল সেইদিকেই। তাঁর কলমে ধার ছিল, আক্রমণের মধ্যে সত্যতাও ছিল। কিন্তু তবুও এ-কথা ভোলা যায় না যে ভবানীচরণ সে-যুগের রক্ষণশীল মনোভাবের প্রধানতম প্রবক্তা। সমসাময়িক অধিকাংশ প্রগতিপন্থী আন্দোলনের তিনি বিরোধিতা করে-ছিলেন—রামমোহন রায়ের সতীদাহ নিবারণ প্রসঙ্গে তাঁর ভূমিকা সবচাইতে লজ্জাকর। সমসাময়িক ভট্টপল্লীর প্রতিক্রিয়া এবং শোভাবাজার রাজবাড়ীর দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর রচনার মধ্যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই সদিচ্ছাসত্ত্বেও ভবানী-চরণের ব্যঙ্গচিত্র একদেশদর্শী। তাঁর রুচিরও প্রশংসা করা চলে না—সেদিন থেকে তিনি 'রসরাজের' গুড়্‌গুড়ে ভট্টাচার্য এবং ঈশ্বরগুপ্তের সমধর্মী। কুরুচিকে আঘাত করতে গিয়ে ভবানীচরণ নিজেই যে কতখানি রুচিহীন হয়ে উঠেছেন, 'নববাবুবিলাস' এবং বিশেষ করে 'নববিবিবিলাস' তার পরিচয় বহন করে।

সমাজ-রসচিত্র রচনায় ভবানীচরণের পরবর্তী স্মরণীয় প্রতিনিধি হলেন 'টেকচাঁদ ঠাকুর' প্যারীচাঁদ মিত্র। তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' সর্বাদি বাংলা সামাজিক উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করেছে। 'আলাল' বেচারামবাবু এবং তস্য দুলাল কাহিনীর নায়ক (অথবা 'ভিলেন') মতিলাল, বালীর বেণীবাবু, স্কুল মাস্টার বাঞ্ছারাম আর সর্বোপরি স্বনামধন্য ঠক

চাচার অপূর্ব চরিত্রচিত্র রচনা করেছেন টেকচাঁদ। ভাষার দিক থেকেও তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য—তাঁর প্রায়-লোকায়ত সহজশৈলীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের গম্ভীর মধুর রচনা পদ্ধতির মিলনেই বঙ্কিমী স্টাইলের জন্ম।

কিন্তু সামাজিক আলেখ্য রচনার চাইতেও প্যারীচাঁদের উপন্যাস রচনার দিকেই ঝোঁক ছিল বেশি। সে উপন্যাস 'রমন্যাস' নয়—আদর্শবাদী প্রচারণায় নিবদ্ধদৃষ্টি প্যারীচাঁদ তাঁর উদ্দেশ্যকে কখনো গুহানিহিত করে রাখেননি। একদিক থেকে ভবানীচরণ যেমন প্রাচীনদলের মুখপাত্র, প্যারীচাঁদ তেমনি অপরপক্ষে নব্যদলের বাণীবহ। প্রাচীন গোত্রীয়দের অন্যতম সরোষ লক্ষ্যবস্তু ব্রাহ্ম-সমাজের সুনীতি ও সুরুচির প্রধান আদর্শগুলোই প্যারীচাঁদের লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে। লেখকের আদর্শবাদিতার আরো সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর 'অভেদী'তে, কিংবা 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়ের' মধ্যে। তাই আত্যন্তিক আদর্শ-বাদ চিহ্নিত 'আলালের ঘরের দুলাল'কে আমরা সম্পূর্ণরূপে সমাজচিত্রের মূল্য দিতে পারি না—এর ওপর 'স্কুল বুক সোসাইটি'র স্থূল হস্তাবলেপ লক্ষ্য করা যায়। "আলালের" গুরুত্ব এবং মহিমার ক্ষেত্র আলাদা।

'আলাল' প্রকাশিত হওয়ার চার বছর পরে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' আবির্ভূত হয়। আবির্ভাব যে চাঞ্চল্যকর হয়েছিল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তার কারণ এই

নক্‌সা'র মধ্যে কাল্পনিকতার স্থান নেই বললেই হয়। দুঃসাহসী কালীপ্রসন্ন দেশের মূঢ়তা, ভণ্ডামি, কুপ্রথা এবং ইতরামির একেবারে ফোটোগ্রাফিক ছবি যেন ক্ষুরধার দৃষ্টির এক্‌স্-রে লেন্‌সে ধরে ফেলেছেন। কোথাও বাস্তব নামধাম বজায় রেখে, কখনো বা সামান্যমাত্র আবরণ রেখে তিনি অনেক তথাকথিত "বিখ্যাত" ব্যক্তির খাঁটি চরিত্রটি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে যা বলেছিলেন—কালীপ্রসন্ন সম্পর্কেও সে উক্তি প্রযোজ্য : তিনি তুলি ধরে সামাজিক বৃক্ষে সমারূঢ় বানরের ল্যাজশুদ্ধু ছবি এঁকে নিয়েছেন।

মধুচক্র যে লেষ্ট্রেপাত ঘটেছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। যাঁদের গাত্রদাহ আরম্ভ হল, তাঁদের পক্ষ থেকেও প্রত্যুত্তরের চেষ্টার অভাব হল না। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় উতোর গাইলেন 'আপনার মুখ আপনি দেখ।' কিন্তু হুতোমের সত্য ও স্পষ্টভাষণে তাঁরই দল ভারী হয়ে উঠল। হুতোমের অনুবর্তী 'সমাজকুচিত্রের' লেখক 'নিশাচর' হুতোমকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানিয়ে এই ভাবে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়কে বিধ্বস্ত করলেন :

'বাজারে হুতোম প্যাঁচা বেরুলো, বদ্‌মায়েসদের তাক্ লেগে গ্যালো, ছেলেরা চোম্‌কে উঠ্‌লো, আমরা জেগে উঠ্‌লুম, চিড়িয়াখানায় নানাপ্রকার স্বর শোনা যেতে লাগলো। "আপনার মুখ আপনি দেখ" এগিয়ে এলো।

আমরা তারে চেনো চেনো কোরে ধোরে ফেল্লেম সেটা পাখী নয়, সুতরাং উড়তে পাল্লে না, আপনার ফাঁদে আপনি ধরা পোড়্‌লো।' (সমাজ কুচিত্র—আমাদের গৌরচন্দ্রিমা)

সব চাইতে কৌতুকের ব্যাপার এই যে শেষ পর্যন্ত এই ভোলাথকেই কালীপ্রসন্নের অসীম অনুকম্পার দ্বারস্থ হতে হয়েছে। 'আপনার মুখ আপনি দেখ' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্যে ভোলানাথ কালীপ্রসন্নের কাছে যে সকাতর আবেদন জানিয়েছিলেন "শ্রীতালাহূল ব্ল্যাক্-ইয়ার, প্রকাশক" স্বাক্ষরিত 'নক্‌সা'র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকার সে ভিক্ষা-পত্রটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ব্ল্যাক্ ইয়ার' (অথবা হুতোম ?) এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করছেন ঃ

'ফলে "আপনার মুখ আপনি দেখ" গ্রন্থকার হুতোমের বসন অপহরণ করে বামনের চন্দ্রগ্রহণের ন্যায় হুতোমের নক্‌সার উত্তর দিতে অগ্রসর হন ও বই ছাপিয়ে ঐ বই হুতোমের উত্তর বলে কতকগুলি ভদ্রলোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে ব্যাচেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহুদিন ঐ ব্যবসা চল্লো না।··· এমন কি, ঐ গ্রন্থকার খোদ হুতোমকেই তাঁর সাহায্য কর্তে ও কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিতে প্রার্থনা করেন।'

ভোলানাথর চিঠির শেষে একটি অধ্যাত্ম-ভাবমূলক কবিতা আছে। হুতোম নিজের নাম প্রকাশ করেননি—ভোলানাথেরও নয়—কিন্তু এই কবিতার মধ্যে দুজনের নামই

সংকেতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যাক ঃ

"কা, য়া রূপ কারাবাসে ঃ কা, লে কালে আয়ুনাশে ঃ
ভো, লা মন ভাবে না ভুলিয়ে।
ব লি, তারে সুবচনে ঃ চ লি, তে সুজন সনে ঃ
হে লা, করে খেলায় মাতিয়ে॥
সদা প্র, মদেতে মত্ত ঃ ত্যজি প্র, সঙ্গের তত্ত্ব ঃ
নিত্য না, চে কুসঙ্গের সনে।
তত্ত্ব র স, পরিহরি ঃ বৃথা র স, পান করি ঃ
মন ম থ, অনুক্ষণ মনে॥
ভারতে ভ ন্ন, তা করি ঃ অভেদ ভিন্ন, তা হরি ঃ
দেখাইছে মু, ক্তির সোপান—"

প্রথম পংক্তির প্রথম, দ্বিতীয়ের দ্বিতীয়, তৃতীয়ের তৃতীয়, চতুর্থের চতুর্থ এবং পঞ্চমের পঞ্চম অক্ষর একসঙ্গে মেলালে পাওয়া যাবে 'কালিপ্রসন্ন'—প্রায় মাঝখানেও নামটির পুনরুক্তি আছে। 'ভোলানাথ মু' পর্যন্ত পাওয়া যাবে প্রথম পংক্তির সমাপ্তি পূর্ব দশম অক্ষর, দ্বিতীয় পংক্তির নবম, তৃতীয়ের অষ্টম, চতুর্থের সপ্তম এবং পঞ্চমের ষষ্ঠ যোজনা করলে। অথবা 'কমা' চিহ্নিত অক্ষরগুলিকে নীচের দিকে পড়ে গেলেই আরো সহজে পাঠোদ্ধার করা যাবে।

এই ভিক্ষাপত্রের দ্বারা একটি তত্ত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। 'হুতোমের' জয়যাত্রার পথে সেদিন কোনো

প্রতিপক্ষই আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। তার কারণ, অকৃত্রিম দেশপ্রেম আর সত্যের শক্তিই ছিল কালীপ্রসন্নের অমোঘ যুদ্ধাস্ত্র।

॥ ৩ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র টেকচাঁদকে প্রশংসা করেছেন—অভিনন্দনও জানিয়েছেন। কিন্তু হুতোম তাঁর প্রীতি-কটাক্ষ লাভ করতে পারেননি। হুতোমের ভাষা বঙ্কিমের ভালো লাগেনি—বক্তব্যও নয়। কিন্তু যুগ-সম্রাট বঙ্কিমের রাজকীয় উপেক্ষা-সত্ত্বেও 'নকৃসা' তার নিজস্ব মর্যাদায় স্বমহিম।

হুতোম তাঁর ভূমিকায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন, "এই নক্সায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করা হয় নাই।" এর ভেতরে ব্যক্তিবিশেষ তাঁর নিজস্ব প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলেও লেখকের বক্তব্য নির্বিশেষ। "আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমনকি স্বয়ং নক্সার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই।" এক কথায় এটি তৎকালীন কলকাতার সমাজ এবং ব্যক্তি চরিত্রের একটি সামগ্রিক চিত্র। কালীপ্রসন্নের মনোগত অভিলাষ ছিল দীনবন্ধুর মতো একটি 'দর্পণ' হাতে তুলে দেওয়া। কিন্তু নীলকরদের বর্বর প্রতিহিংসার কথা ভেবে তাঁকে নিবৃত্ত হতে হয়েছে :

"দর্পণে আপনার কদর্য মুখ দেখে কোনো বুদ্ধিমানই

আরসিখানি ভেঙ্গে ফেলেননা বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায় তারই তদ্বির কত্তে থাকেন, কিন্তু নীল দর্পণের হ্যাঙ্গাম দেখে শুনে ভয়ানক জানোয়ারদের মুখের কাছে ভরসা বেঁধে আরসি ধত্তে আর সাহস হয়না—”

তাই, তাঁকে ‘সং সেজে রং কত্তে’ হয়েছে। কিন্তু এই ‘রং’-এর উদ্দেশ্য তাঁর ব্যর্থ হয়নি। হুতোমের ঠোঁটের ঘায়ে জর্জরিত হয়ে গেছে সামাজিক মর্কটের দল। ‘আজব শহর কল্‌কেতা’-র কোনো আজব বস্তুটিই তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারেনি।

রুচির দিক থেকে হুতোম অসাধারণ সংযত। এক ‘মাহেশের স্নানযাত্রা’র সামান্য কিছু অংশ ছাড়া বইখানি নির্মল কৌতুকে উদ্ভাসিত। অথচ ইচ্ছা করলেই কালীপ্রসন্ন ভবানীচরণের মতো প্যারডির ছলে প্রচুর কুরুচির সরসতা পরিবেশন করতে পারতেন। বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমের প্রতি অবিচার করেছেন।

‘নক্‌সায়’ সমস্ত স্তরেরই মানুষের ছবি আছে, কিন্তু কালীপ্রসন্ন প্রধানত আঘাত হেনেছেন ‘হঠাৎ বাবু’র গোষ্ঠীকেই। সে যুগে নানারকম জাল-জোচ্চুরি এবং ফন্দি-ফিকিরির আশ্রয় নিয়ে যাঁরা রাতারাতি বড় মানুষ হয়ে উঠেছিলেন, শহরের গ্লানি-মন্থনের কাজে তাঁর অপভূমিকাই ছিল মুখ্য। বীরকৃষ্ণ দাঁ আর পদ্মলোচন দত্তজার দল তার সার্থক উদাহরণ। অন্যায়-সঞ্চিত অর্থের বাষ্পে হঠাৎ ফেঁপে

ওঠা বেলুনের মতো এই সমাজ শত্রুরা হুতোমের শাণিত বিদ্রূপের চাবুকে রক্তাক্ত হয়ে গেছে। তাঁর কলমে হঠাৎ অবতার পদ্মলোচনের বিশ্লেষণ এই রকম ঃ

হঠাৎ টাকা হলে মেজাজ যে রকম গরম হয়, এক দম গাঁজাতেও তা হয়না।···কিছুদিনের মধ্যে পদ্মলোচন কলিকাতা শহরের একজন প্রধান হিন্দু হয়ে পড়েন—তিনি হাই তুল্লে হাজার তুড়ি পড়ে—তিনি হাঁচলে জীব! জীব! জীব! শব্দে ঘর কেঁপে ওঠে। ওরে! ওরে! হুজুর ও "যো হুকুমের" হল্লা পড়ে গ্যালো, ক্রমে শহরের বড় দলে খপর হলো যে কলকেতার ন্যাচ্‌রাল হিষ্ট্রির দলে আর জকটি নম্বরে বাড়্‌লো।'

এই ছবির সঙ্গে সঙ্গে দেশের দুর্গতির জন্যে অকৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন লেখক। বাঙালী ধনী-সম্প্রদায়ের হাতে দেশ ও জাতির সর্বতোমুখী উৎকর্ষ সাধিত হবে—এই প্রত্যাশাই তাঁর ছিল। কিন্তু ইংরেজিতে যাকে "Ill begotten money" বলে—তা দেশকে আরো বেশি করে সর্বনাশের দিকেই এগিয়ে দিলে। 'যারা প্রভূত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতি সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্যে কায়মনে যত্ন নেবে, না সেই মহাপুরুষেরাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন, এর বড়ো আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে।'

এই সদিচ্ছাই "হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা"র মূল অনুপ্রেরণা।

শুধু আক্রমণের তিক্ততাই নয়—পত্রে পত্রে প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্নের অশ্রুসিক্ত দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়েছে। তিনি আঘাত করেছেন যতখানি, নিজে আহত হয়েছেন তার চাইতেও বেশি। শ্রেষ্ঠ শ্লেষশিল্পীর—স্যাটায়ারিস্টের এইটিই আদর্শ রূপ। জাতি এবং সমাজকে ব্যঙ্গ করবার অধিকার মাত্র তাঁরই আছে—যিনি সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। যেখানে প্রীতি নেই, সহানুভূতি নেই—হৃদয়হীনতার সেই আঘাতের মধ্য দিয়ে কোনো মহৎ উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হতে পারেনা। তার নির্মমতায় জাতির কল্যাণ হয়না, মানুষ আত্মশুদ্ধির জন্য অনুপ্রাণিত হয়না—বরং হিংস্র ক্ষোভে সে উত্যক্ত হয়ে ওঠে। সহানুভূতির ও বেদনার অশ্রুরেখাই "হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা"র ধ্রুবপদ।

কালীপ্রসন্নের সমবেদনার উজ্জ্বলতম চিত্র হল 'রেলওয়ে।' সাধারণ দরিদ্র মানুষ যারা—যারা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী—তাদের যে ছবি কালীপ্রসন্ন ফুটিয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে এমন এক মর্মভেদী কারুণ্য প্রকটিত হয়েছে যে কৌতুকের আবরণকে তা বারে বারে ছাপিয়ে গেছে। কিভাবে এই মানুষগুলি পদে পদে বঞ্চিত হয়, কেমন করে অসাধু রেল-কর্মচারীর দল তাদের ওপর উৎপীড়ন করে, জমাদার আর চাপরাশীদের বেত কী নির্মম অত্যাচারে তাদের ওপর নেমে আসে এবং সর্বশেষে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা কিভাবে গাড়ীতে স্থান লাভ করে, কালীপ্রসন্নের সে বর্ণনাগুলির তুলনা নেই :

'যে সকল হতভাগ্য ইংরেজ ব্ল্যাক্‌হোলের যন্ত্রণা হতে জীবিত বেরিয়েছিলেন, তাঁরা এই কোম্পানির থার্ডক্লাস দেখলে একদিন এঁদের এজেন্ট্ ও লোকোমোটিব সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে সাহস করে বলতে পাত্তেন যে, তাঁদের থার্ডক্লাস যাত্রীদের ক্লেশ ব্ল্যাক্‌হোলবদ্ধ সাহেবদের যন্ত্রণা থেকে বড় অধিক নয়!'

ব্যক্তিজীবনে কালীপ্রসন্ন নির্ভীক দেশপ্রেমের যে পরিচয় দিয়েছিলেন, 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা'তেও তা আছে। সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস্ মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স্ ছিলেন ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের যোগ্য প্রতিনিধি—তাঁর বক্তব্য ছিল "বাঙ্গালিরা মিথ্যাবাদী ও বব্বলের (বর্বরের ?) জাত।" এই স্পর্ধার প্রতিবাদে দেশের নেতারা রাজা রাধাকান্তদেবের নাটমন্দিরে যে বিরাট সভা করেন, সেই সভায় কালীপ্রসন্ন জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। 'নক্‌সা'-তে সে কাহিনীও আছে। সেই সভা থেকে এক প্রতিবাদলিপি ইংল্যাণ্ডে সেক্রেটারী অব স্টেটসের কাছে পাঠানো হয়। দেশের একদল ইংরেজ-পদলেহী এই সভার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছিলেন, তাঁদের ব্যঙ্গ করে হুতোম বলেছেন: 'ওয়েল্‌সের বিপক্ষে বাঙ্গালিরা সভা করবেন শুনে তাঁরা বড়ই দুঃখিত হলেন— খানা খাবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় মনে পড়ে গ্যালো, যাতে ঐ রকম সভা না হয়, কায়মনে তার চেষ্টা করতে লাগলেন।' কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে এই সভায়

জনমতের নির্ভয় অভিব্যক্তি ঘটল, 'দশ লক্ষ লোকে সই করে এক দরখাস্ত কাষ্ঠসাহেবের (স্যার চার্লস উড-এর) কাছে প্রদান কল্লেন, সেই অবধি ওয়েল্‌স্‌ও ব্রেক হলেন।' অর্থাৎ স্যার চার্লস উডের নির্দেশে গবর্ণর জেনারেলের ধমকে ওয়েল্‌স্ ঠাণ্ডা হয়ে যান।

'মিউটিনি' প্রসঙ্গে বাঙালির ভীরুতাকে লেখক তীব্রতম আঘাত হেনেছেন। 'পাদ্রী লং ও নীলদর্পণে' নীলকরদের অত্যাচারের প্রতি তাঁর অন্তর্জ্বালা প্রকাশিত হয়েছে। বহু বিচিত্র কাহিনী এবং টুকরো টুকরো টীপ্পনির আশ্রয়ে কালীপ্রসন্ন এই বইটিতে জাতীয় জীবনের যে স্বরূপটি উদ্ঘাটন করেছেন, তার তুলনা অন্যত্র দুর্লভ।

তাই সমাজ সচেতন সাহিত্য সৃষ্টি হিসেবে 'নক্‌সা'র মূল্য অপরিসীম। এর রসের দিকও উপেক্ষণীয় নয়। রঙ্গে ব্যঙ্গে, পর্যবেক্ষণে এবং চিত্র রচনায় এর মৌলিকতা অসাধারণ।

যদিও কালীপ্রন্ন উপন্যাস রচনা করেননি—তবু নক্‌সা পড়তে পড়তে মনে হয় তাঁর হাত দিয়ে প্রথম বাস্তবনিষ্ঠ বাঙলা উপন্যাসের আবির্ভাব অসম্ভব ছিলনা। চরিত্র সৃষ্টি এবং বীক্ষণ-নৈপুণ্যে অনেক জায়গাতেই ঔপন্যাসিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। বিশেষত তাঁর বীক্ষাশক্তি ঈর্ষ্যা করবার মতো। একটি সন্ধ্যার বর্ণনা এই রকম :

'সৌখিন কুঠিওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জলযোগ করে সেতারটি নিয়ে বসেছেন। পাশের ঘরে ছোট ছোট ছেলেরা

চীৎকার করে বিদ্দেসাগরের বর্ণপরিচয় পড়চে। পীল ইয়ার ছোকরারা উড়তে শিখচে। স্যাকরারা তুর্গা প্রদীপ সামনে নিয়ে রাংঝাল দিবার উপক্রম করচে। রাস্তার ধারের তুই একখানা কাপড় কাঠ কাটরা ও বাসনের দোকান বন্ধ হয়েচে, রোকোড়ের দোকানদার পোদ্দার ও সোনার বেনেরা তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ৎ কাটচে। শোভাবাজারের রাজাদের ভাঙ্গা বাজারে মেচুনীরা প্রদীপ হাতে করে ওঁচা পচা মাচ ও লোনা ইলিশ নিয়ে ক্রেতাদের "ও গামচাকাঁদে ভালো মাচ নিবি ?" "ও খেংরাগুঁপো মিনসে চার আনা দিবি" বলে আদর কচ্চে —মধ্যে মধ্যে তুই একজন রসিকতা জানাবার জন্য মেচুনী ঘেঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্চেন। রেস্তহীন গুলিখোর গেঁজেল ও মাতালরা লাটি হাতে করে কানা সেজে "অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতাগণ" বলে ভিক্ষা করচে।'

চমৎকার ছবি। পড়তে পড়তে পুরোনো কলকাতার বহুদূর-অপসৃত একটি সন্ধ্যা জীবন্ত হয়ে দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠে। সমসাময়িক পুলিসের আর একটি অনবদ্য বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাক ঃ

'(সকাল বেলায়) পুলিশের সার্জন দারোগা জমাদার প্রভৃতি গরিবের যমেরা রোঁদ সেরে মস মস্ করে থানায় ফিরে যাচ্চেন, সকলেরই সিকি, আধুলি পয়সা ও টাকায় ট্যাঁক পরিপূর্ণ। হুজুরদের কাছে চ্যালা কাঠখানা তামাক ছিলিমটে ও পানের খিলিটে ফেরে না···মনে মনে নতুন ফিকির আঁটতে

আঁটতে চলেচেন কাল সকালেই একজন নিরীহ ভদ্র সন্তানের প্রতি কার্দানি ও ক্যারামত জাহির করবেন—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সাদা লোক, কোরকাপ বোঝেন না, চার পাঁচ জন ফ্রেণ্ড নিয়তই কাচে থাকে, হারমোনিয়াম” ও “পিয়ানো” বাজিয়ে ও কুকুর নিয়ে খেলা করেই কাল কাটান!’ কলুষিত পুলিশী ব্যবস্থা এবং নিরীহ মানুষের দুর্গতির এমন বাস্তব আলেখ্য প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না।

আঙ্গিকের দিক থেকে বইটির চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হল ভাষা। একেবারে সর্বজনবোধ্য চল্‌তি ভাষার লেখা বই হিসাবে বাংলা গদ্যে এইটেই প্রথমতম। আলালের ঘরের দুলালে চলতি রীতির একটা মোটামুটি ধাঁচ আছে আছে বটে, আসলে তার ভিত্তি সরলীকৃত সাধুভাষা। ভাষার প্রয়োগে কালীপ্রসন্ন সম্পূর্ণ ভাবে সংস্কারমুক্ত। অসীম দুঃসাহসের সঙ্গে যেমন তিনি তাঁর নক্‌সার বিষয়বস্তু বেছে নিয়েছেন, তার উপযোগী লেখনশৈলীও তিনি স্বহস্তেই গঠন করেছেন। তাঁর কথাবস্তুর সঙ্গে এই ভাষার মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটেছে।

চলতি ভাষার নিরঙ্কুশ ব্যবহারের ফলে লেখায় কিছু কিছু অসংযম প্রকাশ পেয়েছে—অশালীন শব্দ কিংবা বাগ্‌ধারার (Idiom এর) অবাঞ্ছিত প্রয়োগও ঘটেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে—চলতি ভাষা, ‘প্রাকৃত জনানাং’

ভাষা-ই যে আগামী সাহিত্যের বাহন, বীরবলের সবুজ পত্রে'র পাতায় এ বাণী ঘোষিত হওয়ার অনেক আগেই কালীপ্রসন্ন সিংহ তার সূচনা করে দিয়েছিলেন। আধুনিক গদ্যরীতির তিনিই পথিকৃৎ। প্রথম প্রয়াসের সমস্ত অসম্পূর্ণতাকে অতিক্রম করে তাঁর সৎসাহস ও শক্তিমত্তা আপন গৌরবে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। একান্ত পরিতাপের কথা, কালীপ্রসন্নের এই সংকেতকে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করতে পারলেন না। যদি পারতেন, তা হলে অনেক আগেই তাঁর পরম বলিষ্ঠ লেখনীর ছোঁয়ায় বাঙলার সাহিত্যিক গদ্যে নব যৌবনের জোয়ার আসত।

বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে কালীপ্রসন্ন সিংহ অমর। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' মৃত্যুহীন কৃতিত্ব॥

'কচি ডাবে'র কবি

'ভারতী' সাহিত্যিক গোষ্ঠীর লেখকেরা যখন প্রধানত রবীন্দ্র-প্রভাবিত, তখন তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নিজত্ব উল্লেখযোগ্যভাবেই চোখে পড়ে। 'মরুশিখা-মরীচিকা মরুমায়ার' কবি কর্মজীবনে যেমন বাস্তববাদী ছিলেন, কাব্য-জীবনেও তেমনি এক নতুন বাস্তবতার সুর এনেছিলেন। তাঁর চোখে মোহাঞ্জন ছিল না—ছিল বুদ্ধিদীপ্ত কঠিন জিজ্ঞাসা। উত্তরকালীন 'কল্লোলীয়'দের অগ্রনায়করূপে মোহিতলালের পরেই যতীন্দ্রনাথ স্মরণীয়।

> তুমি শালগ্রাম শিলা,
> শোয়া বসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা!
> ছুটেছে তোমার মৃত্যুতিলক মুক্ত যজ্ঞ ঘোড়া;
> মোদেরি পাকানো প্রেমের দড়িতে বাঁধিতে চলেছি মোরা।
> ছিন্ন গিঁঠানো দড়ি;
> তারি সাহায্যে বাসনা—তোমার যজ্ঞ অশ্ব ধরি!

এই সুরই সেদিনের তরুণ মনের অনুরণন—এই তীব্রজ্বালাই সেদিন 'কল্লোলের' বিদ্রোহীদের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইকবালের বিদ্রোহী কাব্য 'শেকোয়া'র মতো, তাঁর 'ঘুমের ঘোরে', 'প্রথমা' 'বন্দীর বন্দনা' আর 'অমাবস্যার' প্রাথমিক অনুপ্রেরণা।

আধুনিক বাংলা কাব্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের

কবিতাতেই প্রথম দেখা দিয়েছে মুগ্ধ আত্মতৃপ্তির বিরুদ্ধে স্পষ্টোচ্চারিত অভিযান, নিমীলিত নেত্রে সৌন্দর্যরতির উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ আঘাত এবং গণ-সংযোগের প্রচেষ্টা। সাম্প্রতিক যুক্তি ও বুদ্ধিবাদের যুগে তিনি পথিকৃৎ কবি— গণকাব্যের সূচনা তাঁরই হাতে।

যতীন্দ্রনাথ নিজেকে 'দুখবাদী বৈরাগী' বলে পরিচয় দিতে চেয়েছেন। আপাত-দৃষ্টিতে তাঁর কাব্যে কিছুটা দুঃখবাদ আছে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই দুঃখবাদের অর্থ পরাজয়বাদ নয়; পরিপূর্ণ শূন্যতার মন্ত্রে তিনি দীক্ষা নেন্ নি। তাঁর শ্লেষের আঘাত আত্মধ্বংসমূলক নয়—তা আত্মসমীক্ষামূলক। ভণ্ডামি, মূঢ়তা বঞ্চনা আর বাষ্পাবিলতার বিরুদ্ধে তাঁর খরধার আক্রমণ। কপট দেশ-প্রেমীদের প্রতি তাঁর 'ফেমিন রিলিফ' কিংবা 'দেশোদ্ধারের' আঘাত রীতিমত মর্মভেদী :

সেই দুর্যোগ উৎসব যবে ঘনাইবে চারিধার
মেঘে ঝড়ে জলে বজ্রে বাদলে রচিয়া অন্ধকার,—
স'রে পড়ি যদি ক্ষমা কোরো দাদা!
খাঁটি চাষা ছাড়া কে মাখিবে কাদা ?
মনে কোরো ভাই মোরা চাষা নই,—চাষার ব্যারিস্টার!

শুধু ব্যঙ্গের তিক্ততাই যদি তাঁর কাব্যের উপজীব্য হত, যদি 'পিছু হটার গানের' নির্মম বক্রতাতেই তিনি নিজেকে নিঃশেষ করতেন, তা হলে তার শিল্প মূল্য হত সামান্যই।

কিন্তু বঞ্চিত লাঞ্ছিত জীবনের প্রতি কী সীমাহীন মমতা তিনি অন্তরে অন্তরে বহন করে গেছেন, তার নিদর্শন তাঁর 'মানুষ', 'চাষার বেগার' কিংবা 'বারনারী'। যতীন্দ্রনাথের এক চোখে ক্রোধের অগ্নিচ্ছটা, অন্য চোখে করুণার অকৃত্রিম অশ্রু। যতীনাথ ছাড়া আর কে সেদিন এমন করে 'পাঁচীর ছেলে'র মৃত্যুকাহিনী লিখতে পারত—এমন করে বেদনাবিদ্ধ ভাষায় কে আর লিখতে পারত সেই মর্মন্তুদ ইতিহাস ঃ

পথ্য পায়নি, আজ পথ্য পেতো
কেউটের বিষে যদি বেঁচে সে যেতো।
ছাইকুড়ে মান-তলে
দীনের ফসল ফলে,
তাই তুলে চালে জলে সিজায়ে খেতো,
পাঁচী যদি শুখা কাঠ কুড়ায়ে পেতো।
শুখা কাঠও পেয়েছিল এই বাদলে,
তাই হয়,—যবে যার বরাত খোলে।
আনন্দে ভুখা ছেলে
ছেঁড়া কাঁথা টেনে ফেলে
ছাইকুড়ে মান খুঁড়ে যেমনি তোলে,
'মাগো!' ব'লে ছুটে এসে পড়িল ট'লে।

যিনি দরিদ্র, যিনি ভিখারী, সংসারের সমস্ত কালকূট সেবনে যিনি নীলকণ্ঠ—যতীন্দ্রনাথের কাব্যে তিনিই ইষ্টদেবতা। যতীন্দ্রনাথ শৈব। কিন্তু তাঁর শিব যোগরূঢ়

যতীন্দ্র নন—ত্রিলোকবন্দিত আগম-নিগম-পুরাণের প্রবক্তা পঞ্চানন মহেশ্বরও নন। যতীন্দ্রনাথের শঙ্কর লোকায়ত—তিনি মন্ত্রহীন ব্রাত্যদের দেবতা। তাঁর বক্ষে নিখিল বিশ্বের বেদনা—তিনি দুঃখ-দুর্গত মানুষের প্রতিনিধি। প্রাচীন বাঙলা দেশের চাষীরা শিবকে লাভ করেছিল একান্ত আত্মজন রূপে। তারা দেবাদিদেবকে প্রত্যক্ষ করেনি—উমাকান্তের শশাঙ্কমৌলি ঐশ্বর্য রূপের রূপের সন্ধান তারা জানত না। দীনের দেবতাকে ডাক দিয়ে তারা বলেছিল :

'আমার বাক্য ধর গোসাঞি, তুহ্মি চস চাস,
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস—'

যতীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও তার বিস্ময়কর পুনরুক্তি হয়েছে। তিনিও জনগণের দেবতাকে, দরিদ্রের সহমর্মী ভোলানাথকে একই মন্ত্রে আহ্বান জানিয়েছেন, শঙ্করকে তিনি দেখতে চেয়েছেন 'সঙ্কর্ষণ'-রূপে :

বহুদিন গত চৈতি গাজন,
মেঘে-মাঠে আজ অম্বুবাচন,
থামাও তোমার পাগুলে নাচন
বেঁধে নাও জটাজূট,
হাতের ত্রিশূল হাঁটুতে ভাঙিয়া
প্রলয়-শালায় পিটিয়া রাঙিয়া
গড়ে নাও ফাল, হয়েছে সকাল
ধরো লাঙলের মুঠ।

আমাদেরি সাথে চল গো ঠাকুর ওই নাচে-পোড়া মাঠে,
দুই হাতে চেপে চালাও লাঙল পাথরও যেন গো ফাটে।

যতীন্দ্রনাথের এই শিবসাধনা তাঁর কাব্যেরই মর্মকথা। দীন-দরিদ্ররূপী শঙ্কর আজ পথে পথে দিগ্‌বাস হয়ে ঘুরছেন, ক্ষুধার অন্নের বিনিময়ে কখনো পা'ন ভাং ধুতরো, কখনো শ্মশানের ছাই, কখনো বা পৃথিবীর যা কিছু উদ্‌গীর্ণ গরল। হাতের করোটি পাত্রে নিজের অশ্রুই তাঁর একমাত্র পানীয়। স্বার্থপর লোভী মানুষের পুঞ্জ পুঞ্জ উপেক্ষা আর অপমান বর্ষিত হচ্ছে তাঁরই উদ্দেশে। বৈশাখের খররৌদ্রের মতো তাঁরই কণ্ঠের বিষজ্বালায় দিগ্‌দিগন্ত আজ জর্জরিত।

কিন্তু এই শিব একদিন অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবেন নব-জীবনের কর্ষণায়। তাঁর লাঙলের ফালে উপড়ে যাবে মাটির আগাছার জঞ্জাল—নিঃশেষ হবে কীট-পতঙ্গের দল—সমষ্টির প্রান্তরে ফলবে সমগ্রের ক্ষুধার অন্ন ঃ

মাঠে মাঠে মোরা ফলাবো ফসল
ঘাটে ঘাটে তরী হবে চঞ্চল,
আগে বাঢ় ভাই কাঁধে হল, শিরে
কাস্তে চাঁদের ফালা।

যতীন্দ্রনাথের কাব্যে সেই অনাগত ফসলেরই স্বপ্নকামনা। মোহাচ্ছন্ন জীবনের আত্মরতির বিরুদ্ধে তাঁর দুঃখবাদ—অনাগত সামগ্রিক প্রাণনার সপক্ষে তাঁর শিবরাত্রি যাপন। যতীন্দ্রনাথের শিবপূজা ব্যর্থ হয়নি। শীতার্ত তুষার-বর্ষণের

মধ্যে যেমন করে দরিদ্ররূপী ভগবান এসেছিলেন টলস্টয়ের কাছে—তাঁর কবিতাতেও তেম্‌নি 'কচি ডাবের' পশরাবাহী বৃদ্ধ তেম্‌নি এক হিমের রাত্রিতে নীলকণ্ঠ রূপে দেখা দিয়েছেন।

'কচি ডাব' শুধু যতীন্দ্রনাথেরই একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা নয়—সমস্ত বাংলা সাহিত্যেই একটি অপূর্ব সৃষ্টি। যতীন্দ্রনাথের কাব্য-দর্শন এই কবিতাতেই সব চেয়ে উচ্চারিত। পীড়িত, লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি নিবিড়তম বেদনাবোধে, দুঃখহত জীবনের প্রতি আত্মীয়তার অনুভাবে—বিশ্বব্যাপী দীনদরিদ্রের সপক্ষে এইটিই তাঁর বলিষ্ঠতম ঘোষণা ঃ

দারুণ শীতের সাঁঝ হে আমার নটরাজ
কোন রূপে এসেছিলে দ্বারে ?
অশ্রুর সাগর মন্থ হে আমার নীলকণ্ঠ
ভাগ্যে ফিরাইনি একেবারে !
যে-মোহিনী স্বর্ণ টাটে পাতে পাতে সুধা বাঁটে
সে যাদের করে প্রবঞ্চনা,
হে মোর বঞ্চিতরাজ নিঃশেষে বুঝেছি আজ—
আমি যে তাদেরি একজনা !
তাই তুমি নানা ছলে আমার অন্তরতলে,
আমার দুয়ারে আঙিনায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসো কাঁদি ব'লে ভালোবাসো
মোর অশ্রু তোমারে কাঁদায় !

'কচি ডাবের' কবিকে বাংলা সাহিত্যে অগ্রণী গণ-শিল্পী রূপে চিনে নিতে বাঙালি পাঠক কোনোদিনই ভুল করবেনা। ছন্দে, শব্দ-চয়নে এবং আন্তর-ধর্মে লোকায়তিক শিল্পী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর আরাধ্য শঙ্করের মতোই আমাদের একান্ত আত্মজন।

নজরুল

নজরুলকে প্রথম আবিষ্কার করি খুব সম্ভব ১৩৩৬ সালে—যখন সবে দুগ্ধপোষ্যতার সীমাটা মাত্র পেরিয়েছি। বয়েসে নিতান্ত নাবালক হলেও তখনকার বিপ্লব আন্দোলনের আশে পাশে আর ছায়ায় ছায়ায় তখন ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছি—অপরিণত বালক মনে রূপকথার মতো স্বপ্ন ঘনিয়ে আনছে রিভলভার আর ফাঁসির দড়ি। ঠিক এমনি সময়ে সে যুগের দাদারা পড়তে দিলেন "অগ্নিবীণা"।

বয়েসের অনুপাতে একটু বেশিরকমে পরিপক্ক হয়েছিলাম—অন্তত কবিতা পড়বার ব্যাপারে। অর্থবোধের বালাই বোধ হয় ছিল না, কথার ঝঙ্কারই ঢেউয়ের মতো দুলিয়ে দিত মনকে। সেদিন একটা বিশেষ অর্থ, নিজের মনকে সঙ্গে রঙ মিশিয়ে একটা কোনো বিশেষ তাৎপর্যের স্বাদ পেতাম কি না আজ তা স্মরণের বাইরে চলে গেছে। তবে এটা মনে আছে যে দশ এগারো বছর বয়সেই আধখানা 'চয়নিকা' প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। আর যখন তখন সেই সব কবিতা এলোমেলো গুন্‌গুন্ করতে বড় ভালো লাগত—রোমান্টিক্ ছেলেবেলায় যেমনটা হয়ে থাকে।

কিন্তু কবিতার রোমান্স্ তখন মৃত্যুর রোমান্সে রূপান্তরিত হয়েছে। গোপনে খাতার পাতায় কানাইলালকে

নিয়ে কাব্যচর্চা করেছি—নিজের জীবনে ক্ষুদিরামের আসন্ন সম্ভাবনাকে কল্পনা করে রোমাঞ্চিত হচ্ছি প্রত্যেকদিন। আর ঠিক সেই সময়টিতেই এল "অগ্নিবীণা।"'

পাতা খুলতেই প্রথমে চোখে পড়ল :

যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু—
আমি স্রষ্টার শনি, মহাকাল ধূমকেতু—

শুধু চমক লাগল না, স্তম্ভিত করে দিল। বাস্তব জীবনে যে রিভলভারের স্বপ্ন দেখেছিলাম, কবিতাতেও তার অগ্নি-গর্জন প্রত্যাশা করিনি। যেটুকু বাকী ছিল তাকে সম্পূর্ণ করে দিল, যখন পড়লাম :

"আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হবো শান্ত
যবে অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না"—

যে কবিতা পড়ি আর জীবনের যে পথ দিয়ে চলছি—তার মধ্যে যেন সাদৃশ্য ছিলনা, একটা ফাঁক আর ফাঁকি যেন অনুভব করছিলাম। চিন্তায় আর জীবনে, অথবা আরো স্পষ্টভাষায় রুচি আর গতিপথের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য খুঁজে ফিরছি তখন। হয়তো খানিকটা অবচেতন ভাবেই তখন এমন কবিতার সন্ধান করছি যা মনকে ভোলাবেনা,

মনকে জ্বালাবে। নজরুলের কবিতা সেই ফাঁক পূরণ করে দিল।

মনে আছে কী আশ্চর্য সমধর্মিতা পেয়েছিলাম নজরুলের কবিতায়। আমাদের সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত আগ্নেয় যন্ত্রণা যেন তাঁর লেখার প্রতিটি পংক্তিতে পংক্তিতে দীপ্যমান হয়ে উঠত। তাঁর কবিতা তখন আমাদের কাছে বেদমন্ত্র হয়ে উঠেছিল, স্বপ্ন দেখতাম আমাদের রক্তরাঙানো দুঃখের যাত্রায় তিনি চলেছেন অগ্রগামী যাত্রিক—হাতে তাঁর উদগ্নি মশাল। গলায় কোনোকালে কিছুমাত্র সুর নেই যাদের, তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মেলাবার জন্যে সমস্ত বুকের ভেতর থেকে তাদেরও গান জেগে উঠত ঃ

"মোদের আঁধার রাতে বাধার পথে
যাত্রা নাঙ্গা পায়,
মোরা শক্তমাটি রক্তে রাঙাই
বিষম চলার পায়।
যুগে যুগে সিক্ত হল
রক্তে মোদের পৃথ্বীতল
আমরা ছাত্রদল—"

"সর্বাহারা', 'জিঞ্জির' 'ফণীমনসা'। লুকিয়ে পড়া বাজেয়াপ্ত 'বিষের বাঁশী।' তারও পরে এল 'সঞ্চিতা'—বুকের আগুনটাকে অনির্বাণ জ্বালিয়ে রাখবার অফুরন্ত ইন্ধন যেন পেয়ে গেলাম আমরা।

শুধু একটা জিনিস মধ্যে মধ্যে বড় খট্‌কা লাগাত। এমন অগ্নিক্ষরা যাঁর কণ্ঠ, বেদনার কালীদহে জন্ম নিয়ে যিনি দেখা দিলেন কালীয় নাগের মতো, কবিকল্পনায় কুসুম মাল্য নয়—যিনি রচনা করতে এলেন বিষদগ্ধ কাঁটার মালা, তিনি কেমন করে লিখলেন, "বাগিচায় বুলবুলি তুই—" গজল ? যাঁর আকাশে মহাকাল ধূমকেতুর প্রসারিত পুচ্ছে জেগে থাকত যুগান্তের প্রলয়শিখা, তিনি কেমন করে সেই আকাশেই দেখতে পেলেন, 'কাতর ঘুমে চাঁদিমা রাকা ভোর গগনের দরদালানে' ?

আজকে অবশ্য আর সে খট্‌কা লাগেনা। সে ছেলেমানুষী বিচারবোধও নেই। আজ জানি মহৎ প্রতিভার ধর্মই হল বৃহৎ ব্যাপ্তি—মেসোপোটেমিয়ার রণ-প্রান্তর থেকে আমাদের ভালোবাসা আর আনন্দ বেদনা দিয়ে গড়া ছোট ঘরখানি পর্যন্ত তার অবাধ আর উন্মুক্ত সঞ্চরণ। তাছাড়া বিদ্রোহী কবিকেও যে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে গ্রামোফোন্ কোম্পানীর কাছে প্রতিভাকে করুণভাবে বিক্রী করে দিতে হয় এ সত্যটাও তখন পর্যন্ত জানা ছিল না।

* * *

আজ কখনো কখনো মনে হয়, নজরুল যতটা ইমোশন্যাল, ততটা লজিক্যাল্ নন। রচনায় পরিমিতিবোধ সম্পর্কে

তিনি অনেকটাই অসতর্ক, শিল্পীর স্বভাব সুলভ মাত্রা বজায় রেখে অনুভূতির বিকীরণের চাইতে, তার উন্মত্ত বিদীরণটাই তিনি পছন্দ করতেন বেশি।

কিন্তু সেইখানেই তো নজরুলের পরিচয়। তা যদি না হত তা হলে ছন্দে, ভাবে ভাষায় পরিপূর্ণ বিদ্রোহ এনে তিনি ওই বিপুলকায় অগ্নিগর্ভ "বিদ্রোহী" লিখতেন না,—লিখতেন রবীন্দ্রনাথের মতো সংযত, পরিমিত নিখুঁত নিপুণ স্বচ্ছন্দ-যতি একটি ভাবগর্ভ চতুর্দশপদী: "আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি"—

নজরুল তা লেখেননি।

তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ যুগোত্তর আর নজরুল একটি পরিপূর্ণ যুগ। মনে রাখতে হবে সেই যুগ, যখন বাংলার যুবশক্তির আবেগোদ্বেল প্রাণ দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসী নীতির নরম ও মোলায়েম-প্রায় নিয়মতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ অক্রোশে গর্জন করে উঠেছে। বাংলার অগ্নিপুরুষ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গড়ে তুলেছেন তাঁর গরমপন্থী 'স্বরাজ্যদল', আর দেশবন্ধুর পরম অনুগত পার্শ্বচর, যুদ্ধ-ফেরৎ নজরুল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

সে যুগে বাংলার প্রাণের মধ্যে বহ্নিবন্যা বয়ে যাচ্ছিল। দিকে দিকে প্রধূমিত হচ্ছিল বিপ্লব আন্দোলনের জ্বালামুখী। মহাত্মাজীর অহিংস নেতৃত্ব বাঙালির প্রাণে কোনো দিন খুব বেশি সাড়া জাগায়নি, সেদিন তার ভিত্তি ছিল বোধ হয়

সব চাইতে শিথিল। নজরুলের কণ্ঠেই আমরা ধিক্কার শুনেছিলাম ঃ

"সূতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, বসে বসে কাল গুণি
জাগোরে জোয়ান বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি!"

সে যুগে হিসাব ছিল না, বিচারও ছিলনা। অসন্তোষ আর বিক্ষোভের ধারা-প্রতিধারা চারদিক থেকে এসে আছড়ে পড়ছিল। এক স্বাধীনতার একটা অস্ফুট এবং প্রায়নিরর্থক স্বপ্ন ছাড়া দেশের যুবশক্তির মনের মধ্যে যে তুফান বইছিল, তাকে 'অ্যানার্কি' বললে অন্যায় হয়না। অতৃপ্তি এসেছে, অসন্তোষ এসেছে, অস্বীকৃতি এসেছে। এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে আমরা প্রায় সব কিছুই চাইনা—প্রায় সব কিছুই আমাদের কাজ, কর্ম আর গতিপথে দাঁড়িয়ে আছে বাধার একটা উত্তুঙ্গ প্রাচীর তুলে। এদের ভাঙতে হবে, চুরমার করতে হবে, মুছে দিতে হবে এদের অস্তিত্বকে। দূর করতে হবে নারীর অমর্যাদা, ধনতান্ত্রিক অসাম্য, পরজীবী বৈদেশিকের শোষণ, আর ধর্মগুরুদের ভণ্ডামি। তাই নজরুল সমুচ্চকণ্ঠে ধ্বংসের দেবতাকেই ডাক দিয়েছেন। একদিকে যেমন 'ধর্মসংস্থাপক' সব্যসাচীকে আহ্বান জানাতে তাঁর বাধেনি, তার পাশাপাশি যুগে যুগে কলঙ্কিত তৈমুর, চেঙ্গিস, কালাপাহাড়ের মতো মানবতার ঐকান্তিক শত্রুকেও তিনি অসঙ্কোচে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। একদিকে তিনি সাম্যবাদে একান্ত বিশ্বাসী; অন্যদিকে এমন নেতারও বন্দনা

করেছেন—যাঁর সঙ্গে সাম্যবাদ অহি-নকুল সম্পর্কিত। এরই নাম অ্যানার্কিজম্, জীবন সম্পর্কে ক্ষিপ্ত ক্ষুব্ধ নেতিবাদ।

আজকের দিনে অ্যানার্কিজম্‌কে হয়তো পূর্ণ বিপ্লবধর্ম বলে স্বীকার করা যায়না। কিন্তু এ কথা সর্বতোভাবে সত্য যে মধ্যবিত্তের পরম বিতৃষ্ণা ও বিদ্রোহবোধ প্রথমে এই অ্যানর্কিজম্‌কেই আশ্রয় করে—এরই ভিত্তিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে উত্তর কালের পূর্ণতর রাষ্ট্রচেতনা। নিহিলিজ্‌ম না এলে বোলশেভিজ্‌ম আসতে পারত না এ কথা ঐতিহাসিক সত্য। সেদিনের সংগ্রামী বাংলার বিদ্রোহ-তরঙ্গিত ঐতিহ্য থেকেই পরবর্তী সামগ্রিক আন্দোলনের অনুপ্রেরণা এসেছে।

নেতিবাদী যুগে আতিশয্যটা স্বভাবধর্ম, তার প্রকৃতিসিদ্ধ। ভালোমন্দ সব কিছুর বিরুদ্ধে তার অসংযত উত্তাল প্রতিবাদ, বিপ্লবের রক্তশিশুর সে দুঃসহ জন্মযন্ত্রণা। এ যন্ত্রণাকে যেমন যুক্তি দিয়ে সংযত করা যায় না, বেদনার্তের আর্তনাদকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করা যায়না বিচার ও শিল্পবোধের মানদণ্ড দিয়ে, নজরুল সম্পর্কেও এই কথাটিই সত্য। তাঁর কবিকণ্ঠে সমগ্র বাঙলাদেশের কণ্ঠ আমরা শুনতে পাই, তাঁর অসংযত, বেহিসেবী ক্ষিপ্ত বিদ্রোহবাদ সে যুগের বিদ্রোহী বাঙালির মর্মবাণী।

তাই নজরুলের কবিতা শুধু কবিতাই নয়, তা একটা যুগ; তার শিল্পমুল্যের চেয়ে ঢের দামী তার সত্যমূল্য।

সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসের ভাবগীতি বলা উচিত তাঁর কবিতাকে—তা সে যুগের মানস-ইতিহাস।

আর সে ইতিহাসের কাছে এ যুগের ঋণ অপরিসীম; তাঁর কালাপাহাড় বন্দনার প্রয়োজন হয়তো আমাদের ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর সাম্যবাদীর আমরা নিঃসংশয় উত্তরাধিকারী।

বাংলা গদ্যের খাত-বদল

বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের স্তরগুলো পার হয়ে আধুনিক বাংলা গদ্য যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, সেটা নিঃসন্দেহে গর্ব করার মতো। সংস্কৃতের বনিয়াদের ওপর ইংরেজি উপকরণের সহযোগিতায় আধুনিক বাংলা গদ্য একটা চমকপ্রদ রূপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন মনে এসেছে। আধুনিক বাংলা গদ্য কি স্বাভাবিক নিয়মে সাধারণ বাঙালির জীবন থেকে উৎসারিত হয়েছে, না তাকে সচেতনভাবে অন্য কোনো খাতে বইয়ে দেওয়া হয়েছে?

এ-কথা ঠিক যে, ইংরেজের হাতে গড়া কলকাতার যে বাবু সংস্কৃতি তৈরী হয়ে উঠেছিল, দেশের প্রাণের সঙ্গে তার সংযোগটা স্বাভাবিক ছিল না। তার অনেকটা আকস্মিক—অনেকখানি স্বয়ম্ভূ। কলকাতার দ্রুত উন্নতির সঙ্গে তাল দিয়ে পল্লী-বাঙলা দিনের পর দিন পিছিয়ে পড়েছে। নবাবী আমলে শহর আর গ্রামের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নিকটতর ছিল, সমৃদ্ধিগত পার্থক্য থাকলেও জাতিগত পার্থক্য ছিল না। কিন্তু ইরেজের তৈরি কলকাতার সঙ্গে বৃহত্তর বাঙলা দেশের যে ব্যবধান রচিত হল তা কেবল গোত্রান্তরই নয়—ধর্মান্তরও বটে। নদীয়া শান্তিপুরের মতো দুই-চারটি শহরে সেই গোত্রবদলের কিছু কিছু প্রভাব অবশ্যই পড়ল, কিন্তু

সমগ্রভাবে বাবুকেন্দ্রিক কলকাতার যে রূপান্তর ঘটে গেল—বৃহত্তর বাঙলা দেশের কাছে তা সম্পূর্ণ বিজাতীয় হয়েই রইল।

অতএব কলকাতার এই নবতম বাবুগোষ্ঠীকে আশ্রয় করে যে বাংলা ভাষা গড়ে উঠল, তার রূপগত কিছু স্বাতন্ত্র্য যে থাকবেই সেকথা অস্বীকার করা যায় না। শহর মাত্রেরই কিছু না কিছু 'কক্‌নি' থাকে—লণ্ডনেরও আছে। কিন্তু বাংলা গদ্যের খাত-বদলের আসল রহস্য সেখানে নেই। মনে হয়, এর আরো গূঢ় তাৎপর্য রয়েছে।

ইংরেজ আসবার আগে দেশে ছিল মুসলমান রাজা। কিন্তু তখনও ভাটপাড়া ইত্যাদির গোঁড়া পণ্ডিত সমাজ আঞ্চলিক সংস্কৃতঘেঁষা পদ্ধতিকে আঁকড়ে রেখেছিলেন। ওই পদ্ধতির লেখকেরা বিদ্যাসাগরের রচনার পর্যন্ত নিন্দাবাদ করতেন, অপরাধ—দশখণ্ড সংস্কৃত অভিধানের সাহায্য না নিয়েও সে ভাষা লোকে বুঝতে পারে। তাঁরা 'অস্মদ্‌গণের এবম্‌প্রকার' দিয়ে আরম্ভ করতেন। এই রচনারীতি সীমাবদ্ধ ছিল মূলত পণ্ডিতগোষ্ঠীর মধ্যেই—সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের বিশেষ কোনো সম্বন্ধ ছিল না।

তাহলে বৃহত্তর বাঙলা দেশের মানুষের গদ্যরীতি কী ছিল?

তার নিদর্শন মেলে প্রাচীন বাংলার পত্র-লেখন পদ্ধতিতে, 'ব্রাহ্মণ-রোম্যান্ ক্যাথলিক সংবাদে' আর মানো এল্‌-দা

আস্সুম্ সাম্-এর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে।' শেষ বইটি লেখা হয়েছিল ১৭৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার ভাওয়ালে এবং ছাপা হয়েছিল ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালের লিস্বোয়াতে। যতদূর জানা গেছে এইটিই বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত বই এবং বাংলা গদ্যের অন্যতম আদি নিদর্শন।

রোমান্ হরফে ছাপা এই 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' নানাদিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। গুরুশিষ্যের সংলাপের মধ্য দিয়ে রোম্যান কাথলিক ধর্মের মহিমা-প্রচারই বইখানার লক্ষ্য। বইটির বাংলা অংশ মানো এল্-এর লেখাই হোক কিংবা অন্য কোনো বাঙালিই এর রচয়িতা হোন—এর দুটি স্মরণীয় বিশেষত্ব আছে। প্রথমত, এর ভাষার পূর্ববঙ্গীয় কথন-রীতির প্রভাব—দ্বিতীয়ত, এর সরলতা।

যে যুগে গদ্যের কোনো মানই ছিল না, সে-কালে লেখার মধ্যে অন্বয় প্রভৃতির বিপর্যয় থাকবেই। তবু এই ভাষাই সাধারণের ভাষা। দেশী চল্তি শব্দ, ফার্সী শব্দ এবং প্রয়োজনীয় সংস্কৃত শব্দ এর মধ্যে সহজভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বইটি থেকে যথেচ্ছ একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :

" 'হিস্পানিয়া' দেশে মাদ্রিদ শহরে (শহরে) দুই কলিম পুরুষ শত্রু আছিল বিস্তর দিন তাহারা একজনে আর জনেরে তালাশ করিয়াছিল, দাদ তুলিবার কারণ। কষ্টের দিনে ছয় ঘড়ি দুই প্রহর বাদে তাহারা জনে-জনেরে লাগাল পাইল। দুইজনেও তরোয়াল খসাইয়া মারামারি করিল। যে জনে

বেশ তেজবন্ত, সে আরও এক চোট দিল, সে মাটিতে পড়িয়া রহিল, পরাজয় হইল।"

দেখা যাচ্ছে 'কলিম' 'ঘড়ি' 'তালাস' 'দাদের' সঙ্গে 'শত্রু' 'প্রহর' 'তেজবন্তের' বেশ সহজ সমন্বয় ঘটেছে। এই ভাষাই বাঙলার প্রাকৃত জনের ভাষা। সমস্ত বইটিতেই ফার্সী, সংস্কৃত ও দেশী (এরং প্রাদেশিক) শব্দের অসংকোচ মৈত্রী রচনা করা হয়েছে। অবলীলাক্রমে জন-সংযোগ রচনা করাই এর উদ্দেশ্য।

এই অকৃত্রিম বাংলা গদ্যের আর-একটি নিদর্শন রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। ১৮০১ সালে প্রকাশিত এই বইখানি রচিত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। রামরাম নিজে ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিত ছিলেন, স্বভাবতই তাঁর রচনা কিছু অলংকৃত; সংস্কৃত শব্দেরও অপ্রতুল নেই। কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই যে বানান সম্বন্ধে রামরাম নিরঙ্কুশ। এ যে তাঁর অজ্ঞতা—সে কথা বলা যায় না। খুব সম্ভব উচ্চারণগত বানানের দিকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল এবং এক্ষেত্রে তাঁর দুঃসাহস উপেক্ষণীয় নয়।

কিন্তু রামরাম বসু প্রধানত নিন্দিত হয়েছেন তাঁর রচনায় অতিরিক্ত আরবী ফার্সী শব্দের প্রয়োগের জন্যে। এই নিন্দাবাদ করেছেন কোন্ দল? যাঁরা প্রধানত বাংলাকে সংস্কৃতের ছাঁচে ঢেলে নিয়ে তার থেকে ফার্সী শব্দের

বৈদেশিক প্রভাব মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন—তাঁরাই। এ ছাড়া সাহিত্য-সৃষ্টি হিসেবেও রামরাম বসুর বই যে পরবর্তী সমালোচকদের কাছ থেকে সুবিচার পায়নি—এ সম্পর্কে সন্দেহ নেই।

'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' আসলে কিন্তু ফার্সীমূলক নয়। যে-সমস্ত ফার্সী শব্দ এই বইয়ে ব্যবহার করা হয়েছে, তারা তৎকালচলিত স্বাভাবিক প্রয়োগ। 'ওফাত' 'মোরচাবন্দি' 'আঞ্জাম' 'সরবরা' 'শওগাত' বা 'খালিশা দাখিলের' অকৃপণ প্রয়োগ রামরাম বসুর মুসলমান প্রীতির পরিচয় দেয় না। এই বইতে একদিকে যেমন 'তাহার ফরমান প্রাপ্ত এ গোলাম এখানে হয় তবে এ তিন বৎসরের যে বক্রি কর তাহা এ গোলাম হইতে সরবরা হইতে পারে হুকুম হইলে কর্জদাম করিয়া গোলাম এ টাকা খালিসা দাখিল করে'—অন্যদিকে তেমনি 'সে দিবস এবং ঘোর নিশায় দেখেন এক অগ্নি আকার পড়িল শূন্য হইতে এবং তিষ্ঠিল সেই বনে। ক্রমে ক্রমে সেই জ্যোতির বৃদ্ধি হইয়া গগনস্পর্শীয় প্রলয় আনলাকার হইল'—পাশাপাশিই রয়েছে। অর্থাৎ ফোর্ট উইলিঅম কলেজের পণ্ডিতীর মধ্য দিয়েও রামরাম বসুর লোক-সংযোগ হারাননি।

পরিবর্তনটা এল এর পরে। ফার্সীনবীশদের জায়গা দখল করতে লাগলেন সংস্কৃত-নবীশের দল। উইলিঅম কেরী নবদ্বীপ ইত্যাদি নানা জায়গা থেকে যে-সমস্ত পণ্ডিত আমদানি করেছিলেন, তাঁরা ক্রমশই সচেতন ভাবে বাংলা

গদ্য থেকে ফার্সী শব্দকে বিদায় করতে সচেষ্ট হলেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা গদ্যের অন্যতম যুগস্রষ্টা পুরুষ। তাঁর কৃতিত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ইচ্ছে করলে চলতি ভাষায় কী আশ্চর্য স্বচ্ছন্দ গদ্য রচনা করতে পারতেন, তার নিদর্শন তিনি রেখেছেন। কিন্তু আসলে মৃত্যুঞ্জয়ের দীক্ষা ছিল সংস্কৃতে। যে 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় তিনি বিশ্ববঞ্চকের এমন মনোরম সংলাপ লিখতে পেরেছেন, সেই বইতেই তাঁর সংস্কৃতঘেঁষা ভাষার নমুনা এই রকম ঃ

'তাঁহার পুত্র বীরকেশরী নামা এক দিবস অরণ্যান্তরালে মৃগয়া করিয়া ইতস্ততো পথ ভ্রমণ জনিত পরিশ্রমেতে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তরুণিস্তনসুন্দর ইন্দীবর কৈরব কোরক সুন্দরী-মুখ মনোহরান্দোলিত্যোৎফুল্ল রাজীব নির্মল সুস্নিগ্ধ জল পুষ্করণী তটস্থলে বটবিটপিচ্ছায়াতে নিদাঘকালীন দিবসা-বসানসময়ে বটজটাতে ঘোটক বন্ধন করিয়া নিজভৃত্য-জনসমাজাগমন প্রতীক্ষাতে উপবিষ্ট হইলেন!'

দেখা যাচ্ছে 'তাঁহার' শব্দটি, গোটা কয়েক ক্রিয়াপদ এবং কয়েকটি বিভক্তি-চিহ্ন বর্জন করলে এ ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত। 'মোরচাবন্দি' 'শওগাত' বা 'আঞ্জামের' যুগ শেষ হয়ে গেছে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' যে খাঁটি বাংলা অন্বয় দেখা গেছে, রামরাম বসু যে বাংলাকে উচ্চারণানুগ পদ্ধতিতে রচনা করতে চেয়েছিলেন এবং শব্দ ব্যবহারের উদার দানছত্র খুলে দিয়েছিলেন, তাও এখানে সংকুচিত।

বস্তুত, মৃত্যুঞ্জয় ইত্যাদির 'চল্‌তি' বাংলা লেখা কিছুটা বৈচিত্র্য'সম্পাদন মাত্র, তাঁরা সচেতন ভাবেই বাংলা গদ্যের গোত্রান্তর করে চলেছিলেন। 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রের' অল্প পরবর্তী রাজীব মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'—বইতেই এই পরিবর্তনের সুস্পষ্ট লক্ষণ রয়েছে।

এই প্রতিক্রিয়ার স্পষ্ট করে নিদর্শন পাই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থটিতে। গোঁড়া রক্ষণশীল ভবানীচরণ সে-যুগের দিক্‌পাল সাংবাদিক। তিনি বিচিত্রমুখী লেখক—তখনকার বাবু সম্প্রদায় প্রভৃতিকে আক্রমণ করে কয়েকটি রস-রচনাও তাঁর আছে। এই সমস্ত রস-সৃষ্টিতে ভবানীচরণ চল্‌তি শব্দ এবং লৌকিক রীতি আশ্রয় করেছেন, কিন্তু সে কেবল 'প্যারডি' করবার জন্যে। ফার্সী এবং বিদেশী শব্দ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কী ছিল, 'কলিকাতা কমলালয়' থেকে কিছু উদ্‌ধৃতি দিলেই তা হৃদয়ঙ্গম হবে :

"বি, প্র, ভাল মহাশয় শুনিয়াছি যে ভদ্রলোকের মধ্যে অনেক লোক স্বজাতীয় ভাষার অন্য ভাষা মিশ্রিত করিয়া কহিয়া থাকেন, যথা—কম, কবুল, কমবেশ, কয়লা, কর্জ, কষাকষি, কাজিয়া ইত্যাদি ক-কার হইতে ক্ষ-কার পর্যন্ত এবং ইহাতে বোধ হয় সংস্কৃত শাস্ত্র ইঁহারা পড়েন নাই এবং পণ্ডিতের সহিত আলাপও করেন নাই, তাহা হইলে এতাদৃশ বাক্য ব্যবহার করিতেন না, স্বজাতীয় এক অভিপ্রায়ের

অধিক ভাষা থাকিতে যাবনিক ভাষা ব্যবহার করেন না। যথা—' এই বলে মৃত্যুঞ্জয় প্রায় দুশো শব্দের তালিকা দিয়ে তাদের পরিহার করবার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর এই শব্দ তালিকায় 'কল, কায়দা, কিনারা' থেকে 'জঙ্গল' 'ঠাণ্ডা' 'হাওয়া' পর্যন্ত বাদ পড়েনি! এমন কি 'ভিতর' শব্দও তাঁর মতে ভদ্রজনের ব্যবহারযোগ্য নয়—তিনি তার প্রতিশব্দ নির্ধারণ করে দিয়েছেন: 'মধ্য, মধ্যস্থল'! একমাত্র যে-সব ফার্সী ও ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ অপ্রাপ্য, তাদেরই তিনি নিরুপায় হয়ে গ্রহণ করতে বলেছেন—তাঁর মতে এগুলো 'বিষয়-কর্মনির্বাহার্থে কিম্বা হাস্যপরীহাসাদি সময়ে ব্যবহার করণে' দোষ নেই!

ভবানীচরণের মনোভাব অবশ্য গোঁড়া প্রাচীনপন্থীদেরই চিন্তাধারার অভিব্যক্তি। কিন্তু সাধারণভাবে বাঙলা দেশের লেখকেরা যে সংস্কৃতায়নের দিকেই ঝুঁকেছিলেন, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। এর ফলে বাংলা গদ্যের সর্বাঙ্গীণতা ক্রমশই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে লাগল। নবজাগ্রৎ কলকাতা যেমন পল্লী-বঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলছিল—বাংলা গদ্যরীতির এই নবীন গতিও তেমনি একান্ত ভাবে বিদগ্ধ-কেন্দ্রিক ও নাগরিক হয়ে দাঁড়ালো।

স্বাভাবিক ভাবেই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সঙ্গে বৃহত্তর দেশের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হল। বিদ্যাসাগর পণ্ডিতী বাংলাকে অনেকখানি সরল ও সুষমামণ্ডিত করেছিলেন—গদ্যের মধ্যে

কাব্যের সুরভি-সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনিও এই ভাষারই অনুবর্তী। তা সত্ত্বেও তাঁর রচনার সরলীকৃত রূপ পণ্ডিতদের ভালো লাগেনি। সহজবোধ্য ভাষায় কিছু লেখা হলেই সংস্কৃতপন্থীরা ব্যঙ্গ করে বলতেন : 'এ যে সাগরী ভাষা হয়েছে—পড়লেই বোঝা যায়!'

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যকে সাহিত্যিক ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন। সেজন্যে তাঁকে 'শবপোড়া মড়াদাহ' বলে গালও খেতে হয়েছে। কিন্তু ফার্সীমিশ্রিত বাংলা গদ্যের প্রতি তাঁরও কতখানি বিরাগ ছিল, 'বঙ্গদর্শনে' তাঁর গ্রন্থ-সমালোচনায় তার পরিচয় আছে। জনৈক মুসলমান লেখকের রচনাকে তিনি এই বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন যে, লেখকের রচনায় পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ নেই!

এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব অন্যত্রও ঘটতে শুরু করেছিল। 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে' বা 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' যে সামগ্রিক মাতৃভাষার সন্ধান মিলেছিল—তা ক্রমশ দ্বিধাবিভক্ত হল। বাঙলাদেশে জন্ম নিল এক অপূর্ব মুসলমানী ভাষা, যার নমুনা হল : 'পরহেজগার হয় যদি বখিল নাদান!' ভাষার পার্থক্য মানসিক পার্থক্যেরও সৃষ্টি করল কিনা—সে সম্পর্কে এখানে কোনো মতামত দেওয়া সঙ্গত হবেনা। কিন্তু একথা অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে বাংলা গদ্যের এই শুদ্ধীকরণ—তার শক্তি বৃদ্ধি তো করেইনি, বরং তাকে দুর্বল করেই ফেলেছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা যে খাত বদল করেছিল, আজও সেই পথেই তাঁর স্রোত বইছে। ইংরেজি এসেছে, তার ভাষা ও আঙ্গিকের প্রভাব এসেছে, বাংলা রীতি তাতে আরো সমৃদ্ধি আর সূক্ষ্মতা লাভ করেছে। কিন্তু উনবিংশ শতকের সেই প্রথম পর্বেই জনসাধারণের ভাষার সঙ্গে তার যে পার্থক্য রচিত হয়েছে, আজও তা সমান্তরাল সরল রেখার মতোই চলছে। কলকাতার সঙ্গে বাঙলার গ্রামের মতো, এই সংস্কৃতে শুদ্ধীকৃত বাংলার সঙ্গে প্রাচীন ভাষার মিলন দূরে থাক—তার ব্যবধান বোধ হয় বেড়েই চলেছে। আজ যখন বাঙালি লেখকের রচনা জনমনস্পর্শী হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে, তখন সেই অভিযোগের পেছনে শুধু নাগরিক সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যই নয়—দেড়শো বছর আগে বাংলা গদ্যের নব্য বিধানও যে তার জন্য কতটা দায়ী, সে কথাটাও ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

আধুনিক সাহিত্য ও সমালোচক

কিছুদিন থেকেই একটা আলোচনা কানে আসছেঃ সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যে দুর্দিন এসেছে। বর্তমান কালে যুগোপযোগী সাহিত্য রচিত হচ্ছে না, আধুনিক সাহিত্যিকেরা যথাযথ নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারছেন তাঁরা প্রগতির নামে পশ্চাদ্‌গতি ঘোষণা করছেন এবং তাঁদের রচনায় যে জীবন দর্শন ফুটছে, তা কৃত্রিম, আত্মবিরোধী এবং সর্বোপরি কল্প-সর্বস্ব।

ইস্কুলে পড়বার সময় একটা কথা আমরা সবাই শুনেছিঃ ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্তি করে। বর্তমান বিজ্ঞানী-যুগ অবশ্য এ কথা স্বীকার করে না, তার মতে পৃথিবীতে অগ্রগতি আছে, চক্রগতি নেই। তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওই পুরোনো কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না— বিশেষভাবে সাহিত্য সমালোচনার ব্যাপারে।

সাহিত্যের ইতিহাস পড়লে একটা কথা খুব স্পষ্ট করে দেখতে পাইঃ কোনো যুগের সমালোচকই সমসাময়িক সাহিত্যের ওপরে প্রসন্ন দৃষ্টি বর্ষণ করেন নি। তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই ধিক্কার দিয়ে বলেছেনঃ এ যুগের সাহিত্য কিছুই হচ্ছে না—এটা age of decadence! তাই মিল্‌টনের যুগের সমালোচক ড্রাইডেনের মতো দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির

জন্যে হা-হুতাশ করেছেন এবং নোবেল-প্রাইজহীন রবীন্দ্রনাথ হেমচন্দ্র-রঙ্গলালের কাছে নস্যাৎ হয়ে গেছেন। অপরিসীম প্রতিভার দ্যুতিতে যাঁরা নিজেদের মূল্য প্রমাণ করতে পেরেছেন সেই দু-চারজন অতি সৌভাগ্যশীল স্রষ্টা ছাড়া বেশির ভাগ লেখকের রচনার মূল্যই নির্ধারিত হয়েছে ভাবীকালে, আগামী দিনের বিচারকের কাছে। শেক্স্পীঅরকে বাদ দিয়েও এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছেন বার্নার্ড শর অন্যতম মন্ত্রগুরু বিস্মৃত লেখক স্যামুয়েল বাটলার। শ তাঁকে পুনরুজ্জীবিত না করলে তিনি কোথায় থাকতেন কে জানে? লেখক যদি অদৃষ্টবাদী হন, তাহলে ভাগ্যের ওপরে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া তাঁর কোনো সান্ত্বনাই নেই।

সমসাময়িক গুণগ্রাহী সমালোচক কেউ নেই একথা বলি না, কিন্তু অপ্রিয় হলেও এটা হয়তো অসত্য নয় যে বেশির ভাগ সাহিত্য বিচারকেরই সমকাল সম্বন্ধে একটা অশ্রদ্ধা এবং অতীত সম্বন্ধে মোহ আছে। এর জন্যে অনুযোগ বৃথা—কারণ সাহিত্য হল মননশীলতার ক্রমাভিব্যক্তি এবং বহু বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যার পরিণাম সমসাময়িক যুগে নিরূপণ করা সহজ নয়। সমালোচনা অনেক সময়েই জ্যামিতির কাঁটা-কম্পাস ফেলে বোঝবার চেষ্টা আর বলিষ্ঠ সাহিত্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই বাঁধা ধরা পরিমিতির বাইরে ছুটে বেরুবার বিদ্রোহী প্রয়াস। গণ্ডগোলের সূত্রপাতটাও

এইখানেই। জ্যামিতির সূত্র মতে দুটি পার্শ্বপ্রবাহী সরলরেখা —যারা কোনোদিন একসঙ্গে মিলতে পারে না।

সাহিত্যের কী হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত দেওয়া শক্ত নয়, কিন্তু সাহিত্য কী হচ্ছে বা হতে চলেছে এটা বুঝতে গেলে আলাদা রস-দৃষ্টি দরকার। আমাদের অলংকার-শাস্ত্রে যাকে "সহৃদয়তা" বলা হয়েছে সেই বস্তুটির অভাব থাকলে হাই পাওয়ারের চশমা চোখে দিয়ে কমা-সেমিকোলনের ভুল বার করা চলে, কিন্তু রসাস্বাদন করা চলে না। তা ছাড়া আর একটু কথাও আছে। সমালোচকের দায়িত্বে পালনও সব সময়ে সত্যাশ্রিত হয়না। দলগত পক্ষপাত আছে, কোনো কিছুকে ভালো না বলবার এক ধরণের উন্নাসিক শৌখিনতা আছে এবং নিজের বিচার-বুদ্ধি ও সাহিত্য-বিচারের মানদণ্ডে যা ধরা পড়েনা, তার বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতা আছে। খাঁটি সমালোচনার পক্ষে এগুলো অনুকূল নয় এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এ দিকটা ছেড়ে দিয়েও মেনে নেওয়া যাক যে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য যথেষ্ট এগোতে পারছে না। সাহিত্যে সংকট দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মতো যুগন্ধর কথাকার আর দেখা দিচ্ছেন না। যে সাহিত্যিকেরা প্রগতিপন্থী বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন, তাঁরা যথাক্রমে: (১) ধার করা বিদ্যে নিয়ে যুগের শিল্পী হওয়ার প্রহসন করছেন, (২) সাহিত্যকে ধ্বনিসর্বস্ব করে

তুলছেন (৩) তাঁরা দলবিশেষের প্রচারক এবং (৪) বিপ্লবী নন। এদের যোগফল ঃ আধুনিক সাহিত্যচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। একে একে এদের সবগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক।

এটা বিজ্ঞানের যুগ। এবং এই বিজ্ঞান শুধু ফলিত রসায়ন বা পদার্থবিদ্যায় আত্মপ্রকাশ করে না, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শন ও সাহিত্য সর্বক্ষেত্রেই এই বিজ্ঞান নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছে। পৃথিবীর আধুনিক বুদ্ধিবাদীরা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে সাহিত্য-সৃষ্টি বাল্মীকির কবিত্ব লাভের মতো দৈবী আবির্ভাব নয়। 'ইন্‌স্‌পিরেশন' কথাটি নিয়ে অলডাস্ হাক্‌শ্‌লি এক জায়গায় প্রচুর কৌতুক রসের সৃষ্টি করেছেন। এটা প্রমাণিত যে সাহিত্যে কবিতা হোক, ছোট গল্প হোক বা, নাটক যা খুশি হোক এবং তাতে ইমোশান, ইমাজিনেশন ও মেলোড্রামার যত মাতামাতিই থাক, সব কিছুর পেছনে একটা সজাগ হিসেবী (calculative) বুদ্ধি জেগে আছে। যিনি রোম্যান্টিক রচনায় সিদ্ধহস্ত তিনি যে সব সময়েই মনের অতলে কলম ডুবিয়ে লেখেন তা নয়; তিনি বেশ জানেন কতটুকু বিভাবকে আশ্রয় করে কী পরিমাণ কল্পনার খাদ মেশালে তা পাঠকের চিত্তকে উপযুক্তভাবে আলোড়িত করে তুলতে পারে।

সুতরাং এটা জোর করেই বলা যায় যে চসারের সাহিত্যেও তৎকালিক সজাগ বিদ্যাবুদ্ধি ক্রিয়া করেছে,

মিল্‌টনের শৈলীর লেখাও তাই, নাতি-আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে তো কথাই নেই—বরং অবচেতনায় তলাতে গিয়ে তাঁরা সারা দুনিয়ার ইতিহাস-ভূগোল-মিথোলজীর দুষ্পাচ্য লপ্‌সী তৈরী করেছেন। এজ্‌রা পাউণ্ডের 'ক্যাণ্টোজ'গুলির পাঠোদ্ধার করতে হলে পৃথিবীর সমস্ত ভাষা ও পুরাণে দখল থাকা চাই—সেই সঙ্গে হাতের কাজে থাকা চাই গোটা তিনেক ন্যাশনাল লাইব্রেরি! আধুনিক বাঙালি লেখককের বিদ্যাবুদ্ধি থাকাতে অপরাধ নেই; অপরাধ ঘটবে তখনই—যখন দেখা যাবে বিদ্যাবিলাসই তাঁদের লক্ষ্য—রসসৃষ্টি নয়। সৌভাগ্যক্রমে বাংলা-সাহিত্য এখনো সে স্তরে উত্তীর্ণ হয়নি।

কিন্তু কথাটা এখানেই শেষ নয়। একে আরো এগিয়ে নিয়ে বলা যায় যে হালের সাহিত্য কতগুলো শ্লোগান আউড়ে আধুনিকতার মুখোস পরেছে। শ্লোগান সাহিত্য হতে পারে না—এ ব্যাপারে মতভেদ নেই। কিন্তু সমস্যাটা এই যে, আজকের দিনে লেখককে কোনো একটা বিশেষ সত্য আশ্রয় করতেই হবে—যা কিছু ধূলি মালিন্যের উর্ধ্বে বসে তিনি নিরাসক্ত শিল্পচর্চা করতে পারেন না। মনে রাখা দরকার লেখক শুধু লেখক নন, তিনি মানুষ এবং সামাজিক জীব। আধুনিক যুগের প্রত্যেক মানুষের মতোই আধুনিক লেখকেরও একটা নিজস্ব জীবন দৃষ্টি আছে। আর, সাহিত্য কথার মৌলিক অর্থ যদি জীবনচর্চা হয়, তা হলে চারদিকের

প্রবহমান মানব জীবনকে তার মধ্যে রূপ দিতেই হবে। এবং তা যদি হয়, তবে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক—লেখক-শিল্পী অনিবার্যভাবেই সমকালীন সমাজমননকে ফুটিয়ে তুলবেন। অবশ্য, অবিলম্বে পাঠকের হাততালিই মাত্র যাঁর লক্ষ্য—তাঁর দুর্গতি অনিবার্য।

এ সম্বন্ধে একজন কবির পরম উপভোগ্য কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করা গেল ঃ

"What's Faust to me,
a fairy rocket
Slithering with Mephistopheles on the heavenly parquet !
I know --
a nail in my boot that's hurting
is nightmarish than the fantasy of Goethe."

এ যুগের এইটেই মনের কথা। গ্যেটের শয়তান বিভীষিকার চাইতে আমাদের কাছে অনেক বেশি সত্য সামাজিক অত্যাচার, ইনফার্নোর দুঃস্বপ্নের চাইতেও অনেক বেশি দুঃসহ নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন জীবনের অবমাননা। Mermaid Tavern-এর সন্ধান অনেকেই পাইনি, বরং হাতলভাঙা পেয়ালার লাঞ্ছনার অশ্রু মেশানো হাফ কাপ চা-র প্রত্যক্ষ আবেদন আমাদের সাহিত্যিককে অনেক বেশি অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে।

আধুনিক সাহিত্য প্রচারক বলে অখ্যাতি অর্জন করছে। কিন্তু কথাটার অর্থ কী? যদি নিজের বিশিষ্ট উপলব্ধি এবং সত্যবোধকে প্রকাশ করাই প্রচারপ্রবণতা হয়, তাহলে কি বলা যেতে পারেনা যে পৃথিবীর কোন সাহিত্যিক বা শিল্পীই এ অপরাধ থেকে মুক্ত নন—'শিল্পের পরিণাম শিল্প' যাঁদের সিদ্ধান্ত, তাঁরাও নন? প্রত্যেক লেখকেরই নিজস্ব কিছু বক্তব্য আছে এবং সে বক্তব্য না থাকলে তাঁরা কলম ধরতেন না। এবং এও সত্য যে নিজের মত তথা বিশ্বাসকে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সকলেই চেষ্টা করেছেন—আর্টবাদী এবং অনার্ট-বাদী, কন্‌ভেন্‌শনালিস্ট এবং য়্যাণ্টিকন্‌ভেন্‌শনালিস্ট, বস্তুবাদী এবং ন্যাচারালিস্ট, ফ্লেমিশ শিল্পী এবং ইম্‌প্রেশনিস্ট—এমন কি যাঁরা কিছুই বলতে চাননি সেই ডাডাইস্ট্‌রা পর্যন্ত। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যদি প্রকৃতির মধ্যে অধ্যাত্ম রসের সন্ধান পেয়ে থাকেন তবে আধুনিক বাঙালি লেখক—সমকালিক সামাজিক পরিবেশ থেকে তাঁর ভাবদৃষ্টি গ্রহণ করলে ক্ষুণ্ণ হবার কোনো সঙ্গত কারণ আছে কি? গোর্কীর বই পড়ে বিপ্লবী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হতে পারি এবং Sanine-এর মতো কদর্য বই পড়ে আমরা সাধুবাদ করি; শরৎচন্দ্রের মহতী পতিতা সাবিত্রী আর কুপ্রিনের ইয়ামার পতিতাদের মধ্যে নিশ্চয় কোনো মিল নেই—কিন্তু দুজনের লেখা পড়েই আমরা অভিভূত হয়ে যাই। এঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব বক্তব্য আছে এবং নিজের পরিধিতে প্রত্যেকেই তো প্রচারব্রতী। জীবনকে দেখতে গেলে একটা

বিশেষ দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করতেই হবে। গোড়ায় বলে নেওয়া কথাটা সেইজন্যেই আবার মনে পড়ল : উপযুক্ত সহানুভূতি না থাকলে সমসাময়িক সাহিত্যের বিচার হয় না, হতেই পারে না।

এ কথা অবশ্যই সত্য যে বক্তব্যের মধ্যে অনুভূতির আন্তরিকতা না থাকলে সে সাহিত্য নিন্দনীয়। রবীন্দ্রনাথ যাকে "সৌখীন মজদুরি" বলেছেন তা নিয়ে যারা কারবার করে তাদের সুবিধাবাদ বেশিদিন চলে না। যেখানে হৃদয়ের স্পর্শ নেই, শুধু জনপ্রিয় 'tendency'র ওপরে লেখক নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চান, এঙ্গেল্‌সের মতে সেই 'inferior sorts of literati'রা দু দিন পরেই ধরা পড়তে বাধ্য। তা ছাড়া হাক্‌শ্‌লি কিংবা জয়সের মতো কথার কচ্‌কচিও সাহিত্যের গল্পরস ক্ষুণ্ণ করে—কারণ, আর যাই হোক সাহিত্য সাহিত্যই —তা সমাজনীতি রাজনীতির 'অ আ ক খ' নয়। এঙ্গেল্‌স্‌ আরো বলেছেন :—"The more the opinions of the author remains hidden, the better for the work of art"; কিন্তু সেখানে একথা মনে রাখতে হবে, নতুন চেতনার জোয়ার যখন আসে, তখন প্রয়োজনাতীত কূল-প্লাবিতা তার স্বভাবধর্ম, কিছুটা উদগ্র আত্মপ্রকাশ তার স্বভাববৃত্তি। সমালোচককে এ ক্ষেত্রে খানিকটা ক্ষমা করে নিতেই হবে এবং এখানে তাঁর 'সহৃদয়তার' কাছে আবেদন জানানো একেবারে অন্যায় নয়।

আধুনিক সাহিত্যিক অগ্রগামী কিনা, আধুনিক জীবনেই তার জবাব আছে। সাহিত্য জীবনের প্রয়োগফল। দার্শনিক পরিভাষায় বলা হয়েছে বিপ্লব হচ্ছে গুণগত পরিবর্তন— Qualitative change; সেই সঙ্গে দর্শন আরো বলেছে যে এই 'গুণগত পরিবর্তন'টা 'পম্পির শেষ দিনের' মতো আকস্মিক দুর্বিপাক নয়, তার একটা বিবর্তন পর্ব আছে— যাকে 'পরিমাণগত পরিবর্তন' বা Quantitative change বলে আখ্যাত করা হয়। আমাদের রাষ্ট্রজীবনে 'গুণগত পরিবর্তন' আসেনি, পরিমাণগত পরিবর্তনের পালা চলছে—; সাহিত্যের অগ্রণী মনোবৃত্তিকে বিচার করতে গেলেও এই পরিমাণকেই লক্ষ্য করতে হবে—গুণকে নয়, কারণ ডিম ফুটবার আগেই উড়ন্ত পাখিকে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না। এবং, পরিমাণের হিসেব করলে যে কোনো সাধারণ মানুষের কাছেই এটা অস্পষ্ট থাকবে না যে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিসীমার বাইরে আমাদের সাহিত্য কতখানি এগিয়ে গেছে। আরো মনে রাখা দরকার—আমাদের সামগ্রিক জীবনে যখন অগ্রচর বুদ্ধি ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব চলছে, তখন সাহিত্যও সেই দ্বন্দ্বের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে লঘুপক্ষ বিহঙ্গের মতো সার্থকতার স্বর্গলোকে গিয়ে পৌঁছুতে পারবে না। বিপ্লবের সাধনা সাহিত্য করে আসছে, করবেও, কিন্তু যে জীবনে বিপ্লবের রূপ এখনো ছায়া মাত্র আছে, সেই অসম্পূর্ণ জড়তারুদ্ধ জীবনকেও প্রতিফলিত করতে সে বাধ্য।

আধুনিক সাহিত্য যদি নিষ্ঠাভরে আধুনিক জীবনের চর্চা করে এবং সেই সঙ্গে যদি সঞ্চারিত করতে পারে ভবিষ্যতের আশাবাদকে—তবেই সে সাহিত্য যুগ সাহিত্য, সেই সাহিত্যিকই যুগ সাহিত্যিক। বাংলার যে কোনো শক্তিমান আধুনিকের রচনাই এই যুগ-লক্ষণাক্রান্ত হবে এ আশা করা যেতে পারে।

এইখানে একটা স্থূল অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়। আধুনিক সাহিত্য জনরঞ্জক নয়, তা মনকে ভরিয়ে তোলে না। এই অভিযোগের পটভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে জীবনের প্রত্যক্ষ সংঘাতে আজ আমরা এত বিব্রত বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছি যে সাহিত্যের মধ্যে আমরা আশ্রয়েরই সন্ধান করি ; কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে বর্তমান সাহিত্যের মধ্যেও ছায়াকুঞ্জ নেই—নির্মম বাস্তবতার, কঠিন সত্যের মরুভূমি সেখানে ধূ ধূ করছে। প্রাত্যহিক বিড়ম্বনায় জর্জরিত আমরা সাহিত্যের মধ্যেও তার আরো নিষ্ঠুর প্রতিফলন সহ্য করতে পারছি না, গল্পসন্ধানী তথা নীড়সন্ধানী মন ক্রমাগত ধাক্কা খেয়েই ফিরে আসছে। আধুনিক সাহিত্যের প্রতি বীতস্পৃহার এটাই কি মৌলিক কারণ? এবং এই জন্যেই কি সস্তা সিনেমা, রোচক রচনা আর ডিটেক্‌টিভ বইয়ের চাহিদা এত বেশি?

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মতো দিক্‌পাল সাহিত্যিক আজ নেই বলে বাংলা সাহিত্যকে তুচ্ছ করলে অপরাধ হবে। এ

সমষ্টির যুগ, সমবায়ের যুগ; এটাকে Age of fragments বলা যেতে পারে, কিন্তু fragments গুলির একত্রীভূত যে শক্তি তা ব্যক্তি-স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের চাইতে হয়তো খুব কম নয়। তার ক্ষেত্র বহু বিস্তৃত, তার ভাবনা বহুমুখী, তার জীবন-দর্শন বহু-বিচিত্র। কাল থামে না, প্রগতি থামে না, সুতরাং আমাদের সাহিত্যও থেমে দাঁড়ায়নি। বরং লাভের মধ্যে এই হয়েছে যে একটি পরিস্ফীত ধারায় অনাবশ্যক প্লাবন সৃষ্টি না করে তা সহস্রবেণী হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, বহু ক্ষেত্রের মাটিকে উর্বরা করে নানা ফসলকে সে ফলিয়ে তুলছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিচয় রবীন্দ্র শরৎ নামী কোনো মহীরুহে হয়তো নয়, নামী-অনামী জ্ঞাত-অজ্ঞাত বহু ফসলেই তার-পরিপূর্ণতা।

আধুনিক কথাসাহিত্যে সংকট এসে থাকলে সেটা কুয়াসার আড়াল, পাথরের প্রাচীর নয়। মধ্যে মধ্যে পথ ভুল হতে পারে, কখনো কখনো নানা ঝড়ে ঝাপ্‌টায় বিভ্রান্ত হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। সব লেখাই সমান রসোত্তীর্ণ হবে এমন নির্ভুল সাহিত্যিকও কোনো দেশে কখনো জন্মাননি। কিন্তু যে সর্বাঙ্গীণ সমবায়ের কথা বলেছি তার হিসাব নিকাশ করলেই বোঝা যাবে আধুনিক বাংলা প্রগতি সাহিত্য ভবিষ্যতের পথে কতটা এগিয়েছে এবং কতটা এগিয়ে যেতে পারে।

ইংরেজ কবি ডে-লিউয়িস তাঁর The Magnetic

Mountain-এ বাঙালি সাহিত্যিকদের বক্তব্যটা এই ভাবেই বলে দিয়েছেন ঃ

"So its for me the mountain. But before
I begin
I'm taking a light engine back along the line
For a last excursion, a tour of inspection,
To clear the head and to aid the digestion.
Then I'll hit the trail for that promising land ;
May catch up with Wystan and Rex my friend,
Go mad in good company, find a good country,
Make a clean sweep or make a clean end."

'ছিন্নপত্রে'র রবীন্দ্রনাথ

যে কোনো মানুষকে বোঝবার পথে চিঠিপত্রের ভূমিকা অপরিহার্য। একটি সমগ্র ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়াব প্রয়োজনে এই চিঠিগুলো কুঞ্চিকার কাজ করে। এদের মাধ্যমে মানুষের দার্শনিক এবং লোকব্যবহারগত দ্বৈত সত্তারই সন্ধান মেলে। তাই রবীন্দ্রনাথকে অনুধাবন্ করতে হলে "ছিন্নপত্র", "ভানুসিংহের পত্রাবলী" এবং "চিঠিপত্র" একেবারে প্রাথমিক পাঠ। "য়ুরোপ যাত্রীর পত্র" একটু আলাদা জাতের—ওখানে রবীন্দ্রনাথের চোখে সমালোচকের দৃষ্টি এবং ওগুলো পত্রাকারে প্রবন্ধ। রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে গেলে আমাদেব প্রধানত বাকী তিনখানিব ওপরেই নির্ভর করতে হবে।

এ-দিক থেকে 'ছিন্নপত্রে'র জনপ্রিয়তা যেমন বেশি, তার গুরুত্বও তেমনি অসামান্য। এই চিঠিগুলি লেখা হয়েছে ১৮৮৫ সালের অক্টোবর থেকে ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত —মোট দশ বছর ধরে এরা রবীন্দ্রনাথের ডায়েরীর কাজ করেছে। কিন্তু 'ছিন্নপত্রে'র আসল যুগ সুরু হয়েছে ১৮৯১ থেকে—বিলেত থেকে ফিবে এসে পতিসরে জমিদারী তত্ত্বাবধানেব পর্বে।

সময়টা লক্ষ্য করবার মতো। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন

তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ—জীবনের পূর্ণ বসন্ত—কাব্যেরও তাই। মানসী, সোনার তরী আর চিত্রার কাল—ছোটগল্পের স্বর্ণযুগ।

একজন বিদেশী সমালোচকের লেখায় পড়েছিলাম, ত্রিশোর্ধ এবং অনুত্তীর্ণ চল্লিশ—যে কোনো লেখক বা শিল্পীর জীবনের এক বিচিত্র সন্ধিক্ষণ—একদিক থেকে সংকটক্ষণও বটে। প্রথম যৌবনের স্বতোচ্ছল নির্ভাবনা তখন পরিণত বুদ্ধির আবির্ভাবে শাসিত, অথচ জীবন-দর্শনের সম্পূর্ণ রূপটিও তখন পর্যন্ত আয়ত্ত হয়নি—মনের মধ্যে একটা নীহারিকার পালা চলছে। এক পা অতীতে, আর এক পা ভবিষ্যতের মধ্যে। বর্তমানটা আলোড়িত, বিক্ষুব্ধ এবং অনিশ্চিত।

খুব সম্ভব কথাটা ঠিক। অন্তত রবীন্দ্রনাথের জীবনে সত্যটি লক্ষণীয়।

'ছিন্নপত্রে'র কালে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই অনিশ্চয়তার সুরটি বিশেষ করে বেজে উঠেছে। 'মানসী' একদিক থেকে যন্ত্রণার কাব্য। প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের হতাশাজর্জর শূন্যময়তা—অন্যদিকে চল্‌তি রাজনীতির ওপরে সুকঠিন ব্যঙ্গের আঘাত—'মানসী'র ভাবরূপকে মোটামুটি চিহ্নিত করে দিয়েছে। 'সোনার তরী'তে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা আত্মস্থ —দেহগত প্রেম সম্পর্কিত তিক্ততার স্তর পার হয়ে সৌন্দর্য-সাধনার মধ্যে তাঁর সঞ্চরণ, সুগভীর জীবন-প্রীতিও অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত—তবু 'সোনার তরী'র ফলশ্রুতি হল 'নিরুদ্দেশ

যাত্রা'। 'চিত্রা'র ঘাটে সম্পূর্ণ উত্তরণের পূর্ব পর্যন্ত 'তরল-অনল' ঝলসিত গোধূলিবর্ণ সমুদ্রের ওপর দিয়ে এক অনিশ্চিত রূপাভিসার।

উত্তর-তিরিশ এবং অনাগত-চল্লিশ: 'ছিন্নপত্রে' রবীন্দ্রনাথের এই গোধূলিমননের সংকেত।

রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই চাঞ্চল্যবিরোধী। 'বিধাতার কাছে যাদের অনেক বাকী, খালি দৌড় লাগিয়েই যে তাদের 'দেনা' শোধ হয়না—এ-কথা বহুবার, বহুভাবে তিনি বলেছেন। এ নিয়ে দেশের সঙ্গে নানা উপলক্ষে তাঁর মতান্তর এবং মনান্তর ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবের যৌক্তিকতা নির্ণয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু 'ছিন্নপত্রে'র উপক্রমণিকায় কথাটি স্মরণ রাখবার প্রয়োজন আছে।

দেশে তখন উগ্রপন্থী রাজনীতির পদক্ষেপ। মহারাষ্ট্রে টিলকের বৈপ্লবিক আবির্ভাব, বাঙলা দেশে অরবিন্দ ঘোষ এবং বিপিনচন্দ্র পাল। রমেশচন্দ্র দত্তের মতো সমন্বয়ী নেতারা তখন অস্তাচলমুখী—রাজনীতির অগ্নিবর্ণ মেঘের আড়ালে বিপ্লববাদের বজ্র প্রচ্ছন্ন। বুঝতে অসুবিধা হয়না—দেশের এই রক্তসন্ধ্যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সহমর্মিতা ঘটেনি। রক্ষণশীলদের সাবধানী পদক্ষেপ যেমন তাঁর ভালো লাগেনি, তেমনি দেশপ্রেমের অতি-প্রাখর্যও তাঁর অশুভ-সম্ভাবনার মতোই মনে হয়েছিল।

তাই জমিদারী-পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে বাঙলার গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে তাঁর নিকটতম পরিচয়, পতিসর, শিলাইদহ কিংবা সাজাদপুরের ছায়াচ্ছন্ন দিনগুলি—লাগামছেঁড়া ঘোড়ার মতো ফেনোচ্ছ্বসিত পদ্মা—আর সন্ধ্যাতারার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বিশাল চর, এরাই রবীন্দ্রনাথকে বহু-বাঞ্ছিত একটি আশ্রয় এনে দিয়েছিল। আর দিয়েছিল, নিজের অনিশ্চিত মনের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার অবকাশ। প্রকৃতির মধ্য দিয়ে যেমন একদিকে রবীন্দ্রনাথ জীবন-সাধনার একটি সম্পূর্ণ তাৎপর্য খুঁজে পাচ্ছেন, অন্য দিকে দেশের একটি বাস্তব রূপের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটছে। মানবিক প্রেমের সীমা-সংকীর্ণতাকে অনন্ত রূপ আর অনন্ত প্রেমের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন তিনি; বেদের টোল, গ্রাম্য পোস্ট মাস্টার, নববধূর শ্বশুরবাড়ী যাত্রা কিংবা মাস্তুল ঠেলার খেলায় শিশু-মনের অভিব্যক্তিতে 'ছোট সুখ ছোট দুঃখ' কল্লোলিত একটি বাঙলা দেশের পরিচয় নিচ্ছেন তিনি—আবার বিক্ষুব্ধ পীড়িত চিন্তা-চেষ্টাগুলোর হাত থেকে প্রকৃতির কাছে এইভাবে তাঁর অপূর্ব আত্মসমর্পণ ঃ

"একলা বসে বসে আমি যে এর ভিতরে কী অনন্ত শান্তি আর সৌন্দর্য দেখতে পাই সে আর ব্যক্ত করতে পারিনে। একদল আছে তারা ছট্‌ফট্ করে 'জগতের সকল কথা জানতে পারছিনে কেন', আর একদল ছট্‌ফটিয়ে মরে 'মনের সকল ভাব প্রকাশ করতে পারছিনে কেন'—মাঝের থেকে জগতের

কথাটা জগতেই থেকে যায় এবং অন্তরের কথা অন্তরেই থাকে। মাথাটা জানালার উপর রেখে দিই, বাতাস প্রকৃতির স্নেহ হস্তের মতো আস্তে আস্তে আমার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়, জল ছল ছল শব্দ করে বয়ে যায়, জ্যোৎস্না ঝিক্ ঝিক্ করতে থাকে এবং অনেক সময় 'জলে নয়ন আপনি ভেসে যায়।' (ছাব্বিশ)

এই জগতের কথা, অন্তরের কথা আর মানুষের কথাকে আবিষ্কার করবার বাসনা 'ছিন্নপত্রে'র ছত্রে ছত্রে। নাগরিক জীবন, তার বিচিত্র সমস্যা, তার কথা আর কোলাহল—এগুলো এখন রবীন্দ্রনাথের কাছে সুদূরের দুঃস্বপ্নের মতো। যে তীব্রতম অতৃপ্তির তাড়নায় রোম্যান্টিক মন খণ্ড-বিচ্ছিন্ন অসংলগ্নতাগুলির কাছ থেকে নিজেকে অপসৃত করে নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে একটা সামগ্রিক তাৎপর্য এবং সৌন্দর্যের সন্ধান করে, পদ্মার অসীমব্যাপ্ত চরের ওপর দিয়ে চলতে চলতে 'ছিন্নপত্রে' তার উপলব্ধিটি এই রকম :

"আমি যেন সেই মুমূর্ষু পৃথিবীর একটিমাত্র নাড়ীর মতো আস্তে আস্তে চলেছিলুম। আর সকলে ছিল আর এক পারে, জীবনের পারে; সেখানে এই ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এবং উনবিংশ শতাব্দী এবং চা এবং চুরোট। কতদিন থেকে কত লোক আমার মতো এই রকম একলা দাঁড়িয়ে অনুভব করেছে এবং কত কবি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু হে অনির্বচনীয়, এ কী, এ কিসের জন্যে, এ কিসের উদ্‌বেগ

—এই নিরুদ্দেশ নিরাকুলতার নাম কী, অর্থ কী—হৃদয়ের ঠিক মাঝখানটা বিদীর্ণ করে করে সেই সুর বেরোবে যার দ্বারা এর সংগীত ঠিক ব্যক্ত হবে।” (উনচল্লিশ)

জীবনপারের এই দৈনন্দিন তুচ্ছতার ক্লান্তি থেকে রবীন্দ্রনাথ অনির্বচনীয়ের সন্ধান করছেন—হৃদয়বিদারী এক মহাসঙ্গীতের জন্যে প্রতীক্ষা করছেন তিনি। সে সঙ্গীত এই লোক-ব্যবহারের সীমাকে ছাড়িয়ে চলে যাবে, তার বিপুল বিপ্লাবন ছোটখাটো সংশয়গুলিকে নিঃশেষে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে,—সীমাহীন আনন্দের মধ্যে সব কিছু প্রকাশ হয়ে যাবে। সেই আনন্দ, সেই বিশ্বরাগিণী ‘সোনার তরী’তে অস্ফুট গুঞ্জন তুলেছে, ‘ছিন্নপত্রে’ তার জন্মপূর্ব বেদনা।

পদ্মার জল, নদীর ঘাট, বালুর চর, ছোট ছোট গ্রাম, সাধারণ মানুষ—এরা কেউই এখন আর বিচ্ছিন্ন সত্তায় পর্যবসিত নয়। একটি অখণ্ড উদার আনন্দময়তার মধ্যে একটি অচ্ছেদনীয় যোগসূত্রে তারা একসঙ্গে নিবদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতির এই মহাকাব্য পড়তে পড়তে আশ্চর্যভাবে রবীন্দ্রনাথের মন উপন্যাস-সাহিত্য সম্পর্কে বিমুখ হয়ে উঠেছে। সাধারণভাবে, আধুনিক উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্রই হল নাগরিকতা; তার কাহিনী ক্ষেত্র কোনো দূর-গ্রামের পটভূমিকে আশ্রয় করেও গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু উপন্যাসের যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি—তার জীবন-বিচার এবং বিশ্লেষণের যে প্রয়াস—সমীক্ষা করলে দেখা যাবে সেটি নাগরিক।

"কেবল প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস ; কেবল মানব-চরিত্রকে মুচড়ে-নিংড়ে কুঁচকে-মুচকে, তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে, তার থেকে নতুন নতুন থিওরি এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা। সেগুলো পড়তে গেলে আমার এখানকার এই গ্রীষ্মশীর্ণ ছোট নদীর শান্ত স্রোত, উদাস বাতাসের প্রবাহ, আকাশের অখণ্ড প্রসার, দুই কূলের অবিরল শান্তি এবং চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে একেবারে ঘুলিয়ে দেবে।" সুতরাং এ উপন্যাসের ক্ষেত্র নয়,—মনস্তত্ত্ব নয়—সাংসারিক জীবনের সামান্যতম বস্তুগুলিকে ঘেঁটে "বিপর্যয় নথি" সৃষ্টি করবার অবসরও নয়। বরং "বাংলার যদি কতগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর করে ছেলেবেলার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতে পারতুম—তা হলে, ঠিক এখানকার উপযুক্ত হত।" (চুয়াল্লিশ)

রূপকথা লিখবার এই আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্তি পেয়েছে "সোনার তরীর" কবিতা 'বিম্ববতী'তে—স্নো-হোয়াইটের বাংলা সংস্করণে। কিন্তু পদ্যে রূপকথা না লিখলেও রবীন্দ্রনাথের এই আকুলতা রূপায়িত হয়েছে তাঁর এই পর্বের ছোট গল্পগুলিতে। এই গল্পগুলো একদিকে যেমন বাঙলা দেশের আন্তর-সত্তার নবতম আবিষ্কৃতি, অন্যদিকে প্রকৃতির এই মহাকাব্যে তারা যেন এক-একটি শ্লোক। "বেশ ছোট নদীর কলরবের মতো ; ঘাটের মেয়েদের উচ্চহাসি মিষ্ট

কণ্ঠস্বর এবং ছোটখাটো কথাবার্তার মতো ; বেশ নারকেল পাতার ঝুর ঝুর কাঁপুনি, আমবাগানের ঘন ছায়া এবং সর্ষেখেতের গন্ধের মতো—বেশ সাধাসিদে অথচ সুন্দর এবং শান্তিময়, অনেকখানি আকাশ আলো নিস্তব্ধতা এবং করুণায় পরিপূর্ণ। মারামারি, হানাহানি, বোঝাবুঝি, কান্নাকাটি, সে-সমস্ত এই ছায়াময় নদীস্নেহ বেষ্টিত প্রচ্ছন্ন বাংলা দেশের নয়।"

লক্ষ্য করবার মতো, রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের গল্পগুলি এই নিস্তব্ধতা আর করুণা দিয়েই ছাওয়া। স্বপ্ন, গীতিকাব্য আর প্রচ্ছন্ন বাঙলা দেশের বেদনা দিয়েই তার ভাববৃত্ত রচিত। 'গল্পগুচ্ছে'র তৃতীয় পর্বে যখন তির্যক সমস্যা আর মনস্তত্ত্ব এসে ভিড় করেছে—তখন তিনি নাগরিক, শিলাইদহ-পতিসর-পদ্মা-নাগর-ইছামতীর কাছ থেকে অনেকখানি দূরে।

প্রকৃতির এই বিশাল রাজ্য যেমন এক বিচিত্র রূপজগৎ—তেমনি এখানে যদি কোনো বৃহৎ কিছু সৃষ্টি করতে হয়—তা হলে সে হল "আরব্য-উপন্যাস"। শহরের বাস্তবতা-ভিত্তিক মনস্তাত্ত্বিক টানা-পোড়েন নয়—এখানকার এই "প্রাসাদে মানুষের হাসি-কান্না আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নিয়ে কত শত সহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি করা।" আর তা যদি না হয়—তা হলে প্রশান্ত নির্জন দুপুরে প্রকৃতির সঙ্গে মন মিলিয়ে দিয়ে 'পোস্ট মাস্টারে'র গল্প লেখা। "আমিও লিখছিলুম এবং আমার চারদিকে আলো বাতাস

ও তরুশাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ করে দিচ্ছিল। এই রকম চতুর্দিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে নিজের মনের মতো একটা কিছু রচনা করে যাওয়ার যে সুখ তেমন সুখ জগতে অল্পই আছে।" (একশো উনিশ)

'ছিন্নপত্রে' রবীন্দ্রনাথ এই অপূর্ব সুখের মধ্যে ডুবে গিয়ে আগামী জীবনের পূর্ণতর পরিণতির জন্যে অপেক্ষা করেছেন। এ যেন তাঁর ধ্যানের অবকাশ, তাঁর আত্মোপলব্ধির লগ্ন। 'মানসী-সোনার তরীতে' সেই উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয়নি—কিন্তু খণ্ড চেতনা থেকে যে মহাচেতনার দিকে তিনি ক্রমাগ্রসর—এই চিঠিগুলির মধ্যে তার নিভৃত স্বাক্ষর রয়েছে। তাঁর কবিতায় ভবিষ্যৎ রূপাভিসারের প্রথম চরণধ্বনি—রহস্যময় কাণ্ডারীর সঙ্গে এক অপরূপ নিরুদ্দেশ যাত্রা, আর ছোট-গল্পগুলি তাঁর সেই সামগ্রিক উপলব্ধির এক একটি আলোক-বুদ্বুদ—এক একটি স্বসম্পূর্ণ শ্লোক। কিন্তু বুদ্বুদ যেমন স্রোতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও তার অঙ্গী, স্বয়ংসিদ্ধ শ্লোকগুলির সমাবেশে যেমন মহাকাব্য—'ছিন্নপত্রে'র টুকরোগুলোও তেমনি বিরাটের খণ্ডাংশ। এরা একসঙ্গে মিশে গিয়ে আগামী দিনের যে অখণ্ডতাকে রচনা করবে—'ছিন্নপত্রে' তারই পূর্বভাষণ। উত্তর-তিরিশ থেকে অনাগত-চল্লিশের নীহারিকা কাল।

আর একটা কথা। অসংখ্য কবিতা এবং ছোটগল্পের যে প্রাথমিক অঙ্কুরগুলো 'ছিন্নপত্রের' ইতস্তত বিকীর্ণ—তাদের ঐতিহাসিক মূল্যও অপরিসীম॥

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা সময় আসে যখন শিল্পী-সাহিত্যিকের আর কিছু দেবার থাকে না। তখন তিনি অসহায়ভাবে নিজেরই পুনরুক্তি করতে থাকেন, আত্ম-অনুকরণের একটা সকরুণ ব্যর্থতা তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কায়িকভাবে না হলেও সেইখানেই স্রষ্টার মৃত্যু। রবীন্দ্রনাথের মত দু-একটি আশ্চর্য প্রতিভা ছাড়া পৃথিবীর সবদেশেই এই বেদনাভরা মানস মৃত্যু আমরা দেখেছি।

সেই জন্যেই, নির্মম হলেও এ সত্য অস্বীকার করা যায় না যে, নির্বাপিত শিল্পীর দৈহিক মৃত্যুর মধ্যে শোক আছে, কিন্তু ক্ষোভ নেই। তাঁর যা দেবার তিনি দিয়েছেন; সেই দানের যথার্থ মূল্য যদি থাকে, তা হলে ভাবীকালের কাছেও তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি রইল। শিল্পী সেখানে অমর।

কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের মৃত্যু শুধু ক্ষত নয়, তা এমন একটা ক্ষতি যে সুদূর ভবিষ্যতেও তা পূরণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। বাঙালির গড়পড়তা পরমায়ুর হিসেবে তাঁর মৃত্যুকে অকাল-ঘটিত বলব কি না জানি না। কিন্তু বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের দিক থেকে তাঁর শুধু শতায়ু নয়—তার চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘায়ু হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, নাট্যশালা থেকে শুরু করে আধুনিক বাংলা রস-সাহিত্যের উৎপত্তি এবং প্রগতির ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা অনেকেই করেছেন। দেশ তাঁদের সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। কিন্তু এদিক থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ যা করেছেন, তার তুলনা হয় না। একটি মানুষ তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের গণ্ডীর মধ্যেও নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায়ের সাহায্যে যে কী অসাধারণ কীর্তি রেখে যেতে পারেন—সর্বকালের বাঙালির কাছে ব্রজেন্দ্রনাথ তার উদাহরণ হয়ে থাকবেন। ইংরেজোত্তর বাংলা-সাহিত্যের প্রায় সর্ববিভাগকে তিনি যে শৃঙ্খলা ও ঐতিহাসিক পরম্পরার মধ্যে সাজিয়ে দিয়েছেন, তার মূল্য যে কতখানি তা হয়তো সাধারণ বাঙালি বুঝতে পারবেন না; কিন্তু এ সমস্ত জিনিস নিয়ে যাঁদের দৈনন্দিন কারবার, তাঁরা জানেন, ব্রজেন্দ্রনাথ দিগ্‌দর্শকরূপে সম্মুখে উপস্থিত না থাকলে কি সীমাহীন অন্ধকারে তাঁদের হাত্‌ড়ে বেড়াতে হত! অজস্র ভুলে ভরা লং সাহেবের ক্যাটালগের দাসত্ব থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন প্রধানত ব্রজেন্দ্রনাথ। অপরিসীম অধ্যবসায় এবং অক্লান্ত গবেষণার মধ্য দিয়ে পূর্বগামী সাহিত্যসাধক এবং সাহিত্যের যে পরিচিতি তিনি রচনা করে গেছেন, তা হয়তো বহুতর সংশোধন ও সংযোজনের দাবি রাখে; কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ব্রজেন্দ্রনাথের কীর্তিকে ভিত্তি করেই বাংলা সাহিত্যে গবেষণা গঠিত হয়ে উঠবে।

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' 'বাংলা সাময়িক-পত্র' বা 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী শুধু সংকলনমাত্রই নয়। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, অনেকের মতো ব্রজেন্দ্রনাথ শুধু ক্যাটালগই রচনা করেন নি। এই বইগুলিতে তাঁর নির্বাচন এবং নির্ধারণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো। ধারাবাহিক পঞ্জী নয়—সন-তারিখ দলিল-চিঠিপত্রের বিবৃতি নয়—এগুলির মধ্য থেকে তিনি এমনভাবে উপকরণ নির্বাচন করেছেন যে তাদের ভেতর দিয়ে বাঙলা দেশের পরিপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে। আমার তো মনে হয়, এক 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' পড়লেই বিগত শতাব্দীর বাঙলা ও বাঙালির সম্পর্কে যে জ্ঞানলাভ করা যায়, একটি সমগ্র লাইব্রেরি থেকেও সে ভবিষ্যতে সমস্ত জ্ঞান দুর্লভ্য।

ব্রজেন্দ্রনাথ বার বার সবিনয়ে জানিয়েছেন, তিনি সাহিত্যিক নন। হয়তো নন। কিন্তু তাঁর যে কোনও গ্রন্থের সংকলন এবং বিন্যাসের মধ্যে যে রুচি ও পরিচ্ছন্নতার পরিচয় মেলে তা শিল্পীসুলভ। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়েই ধরা পড়ে, ব্রজেন্দ্রনাথ শুধু গবেষক নন, তিনি আর্টিস্টও বটেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিল্পী ব্রজেন্দ্রনাথ হয়তো কোনো-দিনই রসিক-মহলে স্বীকৃতি পাবেন না। কারণ, যে কাজ তিনি বেছে নিয়েছিলেন, তাতে খ্যাতির সম্ভাবনা নেই, জনপ্রিয়তার অবকাশ নেই, মুগ্ধ ভক্তের উচ্ছ্বসিত প্রীতি-

নিবেদন নেই, অর্থাগমেরও সুযোগ নেই ; এ কাজ শুধুমাত্র সাধকেরই—ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মই যাঁর শেষ কথা।

অথচ, এর চেয়ে অনেক অল্প পরিশ্রম করেই ব্রজেন্দ্রনাথ জনপ্রিয় হতে পারতেন। নামমাত্র মূলধন সংগ্রহ করে, বাগাড়ম্বরের ঘন ঘটায় গবেষক এবং স্রষ্টার জয়মাল্য নিয়েছেন বাংলা দেশে এমন ব্যক্তির অভাব নেই। কিন্তু হাততালির মোহ ছিল না বলেই ব্রজেন্দ্রনাথ নিজেকে বা দেশকে ফাঁকি দেওয়ার কথা কল্পনাও করেন নি। তাঁর সত্যনিষ্ঠ মন প্রতিটি জিনিসকে নির্ভুলভাবে বুঝতে এবং চেষ্টা করেছে। তাঁর উদ্যম এবং ঔৎসুক্যের মধ্যে কোথাও ক্লান্তি ছিল না। প্রতিটি তথ্যকে তিনি বারে বারে যাচাই করে নিয়েছেন, যতক্ষণ নিঃসন্দেহ না হয়েছেন ততক্ষণ তাকে তিনি গ্রহণ করেন নি। তাই রচনাকে সুপেয় পানীয় না করে তাকে তিনি পুষ্টিকর খাদ্য করে তুলেছেন ; আর এ জাতীয় খাদ্যের প্রতি অরুচি আছে ব'লেই বাঙালীর মানসিক স্বাস্থ্যের দিকটা আজ এমনভাবে পঙ্গু হয়ে আসছে।

ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণার একটি দিক বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইংরেজীতে যাকে "Open mind" বলে, তাঁর মধ্যে সেই সুস্থ ঔদার্য চমৎকারভাবে প্রকটিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, আমাদের যে কোনও আলোচনা এবং গবেষণার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদেরই আরোপ করতে চাই, অর্থাৎ যোগফল আগে ক'ষে নিয়ে প্রয়োজনমত সংখ্যা-সন্নিবেশ

করি। সাহিত্য-বিচারে এ রীতি কখনও কখনও গ্রহণীয় হতে পারে, কিন্তু গবেষণার ক্ষেত্রে এ মনোভাব মারাত্মক। পূর্বকল্পিত একটি সিদ্ধান্তকে যেমন করে হোক প্রমাণ করতে হবে, এ মনোভঙ্গি গবেষকের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন অনেকগুলি সত্যকে পাশ কাটিয়ে যেতে হয়, পৌর্বাপৌর্যহীন বিচ্ছিন্ন অংশকে পূর্ণাঙ্গ ব'লে চালাতে হয়, অর্ধসত্যকে সত্য ব'লে দাবি করতে হয় এবং নিঃসংশয় ভ্রান্তিকেও অন্ধ গোঁড়ামির সাহায্যে আঁকড়ে রাখতে হয়। শুধু অহমিকা এবং আত্মতুষ্টির খাতিরে এ জাতীয় আত্মবঞ্চনা বাঙলা দেশে বহুবারই আমরা দেখেছি। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ এ রকম কোনও পূর্বনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর কাজে এগিয়ে আসেননি। তাঁর মন সংস্কারবিহীন, তাঁর বিচার অপক্ষ-পাত। প্রিয় হোক আর অপ্রিয় হোক, সত্যজিজ্ঞাসাই তাঁর কাম্য, তিনি সত্যব্রত। নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ তিনি সব সময়ে গ্রহণ করেছেন, অপরের ঋণ সানন্দে স্বীকার করে গেছেন।

কিন্তু মজার কথা এই, তাঁর ঋণ অনেকেই স্বীকার করেন নি। ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণা থেকে বহু জনেই বহুভাবে উপকরণ গ্রহণ করেছেন, অথচ তাঁদের মধ্যে একটা বৃহদংশ ব্রজেন্দ্রনাথের নামোল্লেখ পর্যন্ত করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন।

হয়তো তার একটা কারণ আছে। সাহিত্যে ব্যাকরণের নিয়ম মানতে গিয়ে আমরা যেমন বৈয়াকরণের উল্লেখ করি

না, অথবা বানানের ভ্রান্তির জন্যে অভিধানের দ্বারস্থ হয়েও অভিধানিককে কৃতজ্ঞতা জানাই না, বাংলা-সাহিত্যমূলক গবেষণায় ব্রজেন্দ্রনাথের ভূমিকাও তাই। তিনি এমনি অপরিহার্য, এমনি স্বতঃসিদ্ধ যে, তাঁকে শিরোধার্য করেই আমরা যাত্রা আরম্ভ করি। আমি নিজে শিক্ষাব্রতী। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সাহিত্যের ইতিহাস পঠন-পাঠন প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অভিধানিক অথরিটি ; স্বীকৃতি কথাটা তুচ্ছ—তাঁকে আমরা আত্মসাৎ করে নিয়েছি।

এই জন্যেই ব্রজেন্দ্রনাথের আরও বহুকাল বেঁচে থাকবার প্রয়োজন ছিল। শাস্ত্রমতে, অন্তত বাংলা দেশে, পঞ্চাশোর্ধে সাহিত্য-প্রতিভায় ভাঁটার টান পড়ে। কিন্তু গবেষকের ক্ষেত্রে তার বিপরীত। তাঁর বয়স যত বাড়ে, অভিজ্ঞতা তত বেশি পরিমাণে সঞ্চিত হয়—তাঁর বিচারবোধ তত পরিচ্ছন্ন এবং উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই উজ্জ্বলতাতেই ব্রজেন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে তাতে ছেদ পড়ল। অনেকগুলি আরব্ধ কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারলেন না, তাঁর সাধনার অনেকখানিই অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। দুর্ভাগ্য এই, বাংলা দেশে তাঁর অসমাপ্ত কর্মভার তুলে নেবে—এমন মানুষও দেখা যাচ্ছে না।

ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আর একটা কথা বার বার আমার

মনে পড়ছে। সাহিত্যিক বলতে যা বোঝায় হয়তো তা তিনি ছিলেন না। কিন্তু আমাদের ছেলেবেলায়—সম্ভবত অধুনালুপ্ত 'খোকাখুকু' মাসিকপত্রের পাতায় তিনি ছোটদের জন্যে যে সব ঐতিহাসিক কাহিনী রচনা করতেন, আমরা তা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়তাম। তাঁর 'কেল্লা-ফতে' বা 'রণডঙ্কা' আমাদের শিশুচিত্ত জয় করে নিয়েছিল। সরল সুন্দর ভাষায় সেদিন ইতিহাসের যে সব কাহিনী তিনি আমাদের শুনিয়েছিলেন, তাদের আকর্ষণ যে তখনকার দিনের রূপকথা-উপকথার চাইতে কিছুমাত্র কম ছিল না—সে কথা আজও আমি ভুলি নি।

যত দূর জানি, পাকা সাহিত্যিকের কলম হাতে না থাকলে শিশুচিত্ত হরণ করা যায় না। অতএব সাহিত্যের পথে পদক্ষেপ ব্রজেন্দ্রনাথের পক্ষে অনধিকারীর হত না। তবু সে পথ ছেড়ে দিয়ে কেন তিনি গবেষণার কণ্টকারণ্যে প্রবেশ করেছিলেন, তার উত্তর খুঁজলেই ব্রজেন্দ্রনাথের ত্যাগ ও তপস্যার খানিকটা পরিমাপ আমরা করতে পারব।

'পরশুরামের কুঠার'

নামে পরশুরাম, কিন্তু হাতে মাতৃঘাতী কুঠার নেই—আছে জল-দেবতার দেওয়া সোনার কুঠার। তাতে ভয়ের ভান আছে, কিন্তু ভয় নেই। বাড়তির ভেতরে আছে তার অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্য—দীপ্তি আর দুমূর্ল্যতায় তা চিরদিন সঞ্চয় করে রাখার মত ঐশ্বর্য।

পরশুরামের লেখা সম্পর্কে এর প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

পরশুরামের পূর্বসূরি হিসেবে স্বভাবতই মনে পড়বে 'কঙ্কাবতী'-খ্যাত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে। তাঁর 'ডমরুধরে'র সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা স্বয়ংসিদ্ধ 'আই কেদার চাটুয্যে—নো জু-গার্ডেন'-এর আদিপুরুষকে চিনতে পারবেন। আসলে, বীরবলী চাপা হাসি আর বিদগ্ধ ব্যঙ্গের যুগে বাঙালির খাঁটি বৈঠকী রসিকতাকে যিনি নতুন করে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করলেন, তিনিই পরশুরাম। সেই জন্যেই আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দিগ্বিজয় করলেন।

এ কথা বললে ইতিহাসবিরোধী হয় না যে পরশুরাম বাংলা সাহিত্যে আসবার আগে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল শ্লেষের পালা। তাতে একদিকে আত্মসমালোচনা, অন্য দিকে আক্রমণ। 'পঞ্চানন্দ,' 'লোকরহস্য' ইত্যাদিতে তার

সূচনা আর 'নীল-লোহিতে' তার পরিণতি। মাঝখানের ক্রোড়পত্র ত্রৈলোক্যনাথকে প্রায় আমরা ভুলতেই বসেছিলাম, বিরাট রবীন্দ্রনাথের বিশাল জীবনকাব্যে 'হাস্য-কৌতুক' 'ব্যঙ্গ-কৌতুক,' একটুখানি পাদটীকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্লেষের যুগে জন্মে পরশুরাম শ্লেষের নির্মোক নিয়েছেন —কিন্তু আসলে ওটা লক্ষণা—অভিধা নয়। শ্লেষ বস্তুটা বস্তুতান্ত্রিক, তার আক্রমণ স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন। কিন্তু কৌতুক বস্তু থেকে উৎসারিত হয়েও বাস্তবাতীত—তার আবেদন ব্যক্তি বা সমাজকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে ছড়িয়ে যায়। শ্লেষের কাঁটার ওপর একটুখানি স্বচ্ছ রেশমী আবরণ থাকে; কিন্তু কৌতুক জীবনের একটি বালির বিন্দুকে ঘিরে ঘিরে শুক্তির মতো লালাক্ষরণ করে—একটি চমৎকার মুক্তা সৃষ্টি হয়—বালুকণার কথাটা মনেও থাকে না।

পরশুরামের রচনাগুলি এই মুক্তো। বালির একটা কণা, একটু পাথরকুচি আছে বই কি। গাণ্ডেরীরাম বাটপেরিয়া, ডাক্তার তপাদার, স্যর গব্‌সন টোডি, লালিমা পাল (পুং) কিংবা জিগীষা দেবী—সেই অণুতম উপকরণ। যে-কোনো ক্রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ সাহিত্যিক এদের নিয়ে তীব্র শ্লেষের আক্রমণ হানতে পারতেন—তাঁব চাবুকের জ্বালায় আমাদের সর্বাঙ্গ জর্জরিত হতে পারত। কিন্তু পরশুরাম এদের ওপর প্রসন্ন আনন্দের মধুলেপ দিয়েছেন একটির পর একটি—excess বা আতিশয্যের এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছেন

যেখানে পরমানন্দে তাঁর লেখা সমানে উপভোগ করতে পারে ওই গাণ্ডেরীরাম—গবসন টোডি আন্‌লিমিটেড!

শ্লেষের দর্পণে মানুষ নিজের প্রতিফলন দেখে শিউরে উঠতে পারে। কিন্তু পরশুরামের লেখা মায়া-দর্পণ: তাতে বাস্তব অসঙ্গতি, ভণ্ডামি ও মূর্খতাগুলো রূপকথার মতো রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। 'কচি-সংসদের' কথাই ধরা যাক। এক সময়ে বাংলা দেশে প্রচণ্ড বেগে তারুণ্যের অভিযান শুরু হয়েছিল—সেটা ইতিহাসের সত্য। সত্যেন দত্ত বলেছিলেন, 'যৌবনে দাও রাজটীকা'—আর রবীন্দ্রনাথ সবুজ প্রাণের গান শুনিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেটা প্রায় প্যারডি হয়ে দাঁড়াল। এমন একটা কালও গেছে, যখন বাঙালি তরুণেরা লীলায়িত ভঙ্গিতে বাবরী দুলিয়ে পথ হাঁটতেন—কাঁধে দুলত বাসন্তী রঙের চাদর, সেই চাদরের কোনায় বাঁধা থাকত জুঁই কিংবা রজনীগন্ধা—লাল চটি টানতে টানতে তাঁরা থ্যাকার স্পিংক কিংবা নিউম্যানের দোকানে বিলিতী কবিতার বই কিনতে যেতেন। অনুকরণটা রবীন্দ্রনাথের—কিন্তু শিষ্যদের এই মূর্তি দেখে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত আঁতকে উঠতে হয়েছিল।

'কচি-সংসদ' এই তারুণ্য-তাড়িত তরুণদেরই রসরূপ। কিন্তু দার্জিলিঙের 'মুন-শাইন ভিলা'—কচিদের বিচিত্র সংবাদ আর কেষ্টর 'হাইকোর্টশিপ' সমস্ত জিনিসটাকে এমন অপূর্বতা দিয়েছে যে যাদের ওপর পরশুরামের আঘাত এসে

পড়েছে—তারাও জানতে পারেনি এ আক্রমণ তাদেরই ওপর। এ যেন সেই বিচক্ষণ তলোয়ারীর গল্প। এমন নিপুণ হাতে আশ্চর্য সূক্ষ্মতার সঙ্গে সে প্রতিপক্ষের শিরশ্ছেদ করেছিল যে ছিন্নকণ্ঠ লোকটা পর্যন্ত সে দুর্ঘটনা জানতে পারেনি। নিরুপায় ছেদনকর্তা তার নাকের সামনে ধরল এক ডিবে কড়া নস্যি—হাঁচির চোটে কাটা মাথাটা গড়িয়ে পড়ল।

পরশুরাম মুণ্ডচ্ছেদ করেছেন—কিন্তু এই রকম সূক্ষ্মতার সঙ্গে। অথবা ওঁর হাতে ওটা সোনার কুঠার—ওতে ভয় নেই—ভয়ের ভানই আছে। ওটা নরহত্যার জন্য নয়—পরম সমাদরে তুলে রাখবার জন্য।

কিন্তু ওটা যদি শ্লেষ হত? তা হলে তার রূপ কী হতে পারত—বঙ্কিমচন্দ্রের "লোক রহস্যের" পাতা থেকেই সেটা বোধগম্য হতে পারে। জুয়াচোর সাধু নিয়ে পরশুরামের 'বিরিঞ্চি বাবা' গড়ে উঠেছে—কিন্তু যে কলম নিয়ে ভোল্‌টেয়ার ('বোল্‌তের') চার্চের বিরুদ্ধে নেমে পড়েছিলেন—সে কলম পরশুরামের হাতে থাকলে ওই লেখার বিষাক্ত জ্বালায় সমস্ত সমাজ পুড়ে খাক হয়ে যেত।

প্রাচীন বাঙালি শ্লেষ জানত না—কৌতুক জানত। আধুনিক শ্লেষটা প্রধানত বিদেশ থেকে আমদানি—'ভ্যানিটি ফেয়ারের' উত্তরাধিকার। পুরোণো বাঙলা দেশে গালাগালি ছিল—প্রচুর পরিমাণেই ছিল; তার চেহারাও ছিল যেমন

স্পষ্ট, তেমনি নগ্ন। তাতে শ্লেষের নুন-লঙ্কার জ্বালা থাকলেও—উচ্চণ্ড অট্টহাসির প্রলেপে সে জ্বালা ঢেকে যেত। দাশরথি রায় তার প্রমাণ। পরশুরাম গালাগালি বাদ দিয়ে কেবল অট্টহাসিটুকুই বেছে নিয়েছেন্। উপমা দিয়ে বলা যায়, যে মানুষ হাঁ করে ঘুমোচ্ছে, তার মুখের ভেতর বড় জোর একটা 'সুগার কিউব' ফেলে দিয়ে মজা দেখেছেন—তার বেশি কিছুই নয়।

বিদেশী সাহিত্যের কার সঙ্গে তাঁর তুলনা করা চলে? মার্ক টোয়াইন? খানিকটা—সবটা নয়। জেরোম কে জেরোমি? কিছুটা। মুন্‌রো—'সাকী'? কখনো কখনো। চার্লস্ ডিকেন্‌স্? নাঃ—তাঁর মিস্টার পিক্‌উইক্ ডন কুইক্‌সোটের মতো অশ্রুসিক্ত। বিয়ারবোম? উহুঁ—দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আকাশ পাতাল। একেবারে আধুনিক এরিক নাইট? এরিক নাইট-এ 'ফান্'-এরই প্রাধান্য, তাঁর কল্পনা অদ্ভুত—তিনি নক্‌সা আঁকেন না—জমাট গল্প লেখেন। তা হলে অধ্যাপক স্টিফেন লিকক? হ্যাঁ—অনেকখানি। তবুও সবটা নয়।

আসলে, পরশুরামের হিউমার জাতিতে ধুতি চাদর পরা উচ্চবিত্ত শান্তিপ্রিয় বাঙালি—তার যথাস্থান রায় বাহাদুর বংশলোচনের বৈঠকখানা। 'অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের' বিশ্লেষণে কিংবা 'লেক্‌চারিং টুরের' বর্ণনায় লিকক যে বিদগ্ধ ব্যঙ্গ-জগতের সৃষ্টি করেছেন—তার কাছ থেকে উদো,

নগেন, বিনোদ উকিল, স্বয়ং বংশলোচন, এমন কি 'দি গ্রেট্ চাটুজ্জে' পর্যন্ত পালাতে পথ পাবেন না। রায়বাহাদুরের বৈঠকখানা না হলে বাবা দক্ষিণ রায়ের এমন পাঁচালী আর কোথায় শোনা যাবে ?

"ছাগল শুয়ার ভেড়া হিন্দূ মুছলমান।
প্রভুর উদরে যাঞা সকলে সমান॥
পরম পণ্ডিত তেঁহ ভেদজ্ঞান নাঞি।
সকল জীবের প্রতি প্রভুর যে খাঞি॥
দোহাই দক্ষিণ রায় এই কর বাপা।
অন্তিমে না পাঞি যেন চরণের থাপা॥"

লিকক যত বড় পণ্ডিতই হোন না কেন—তিনি এই 'পাঁচালী'র অকৃত্রিম বাঙালি রসে 'বঞ্চিত গোবিন্দ দাস।' তবুও লিককের সঙ্গেই পরশুরামের কিছুটা সহমর্মিতা আছে। লিকক নক্সা এঁকেছেন—সম্পূর্ণ গল্প লেখেননি—পরশুরামও প্রায় তাই। লিকক্ অসামান্য পণ্ডিত—দিক্পাল অধ্যাপক—বিখ্যাত রাসায়নিক একদা বেঙ্গল-কেমিক্যালের অন্যতম প্রাণ পুরুষ পরশুরাম সম্পর্কেও প্রায় একই কথা। লিককের রচনাতেও একটি ক্ষীণ আক্রমণের সূত্র আছে; কিন্তু পরশুরামের মতোই তাতে তাঁর কৌতুকখণ্ডগুলো 'মণিগণা ইব' দীপ্তি পায়—সূত্রের কথা কারুর মনেও থাকে না। লিককের অনবদ্য প্রবন্ধগুলোর

সঙ্গে পরশুরামের 'তিমিঙ্গিল' জাতীয় রচনাগুলোর স্বচ্ছন্দেই তুলনা করা যায়।

পরিণত বয়েস—অসুস্থ শরীর, তবু আজও পরশুরাম "রটন্তীকুমারের" মতো মনোরম গল্প লিখছেন, এখনো "নীল তারা" পড়তে গিয়ে তাঁর সেই দিগ্বিজয়ী আবির্ভাবের কথা মনে পড়ে যায়। তবে কাল-প্রভাবেই কি না জানি না—ইদানিং তাঁর কোনো কোনো রচনায় যেন অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠছে—তাঁর কৌতুকদীপ্ত ললাটে ভ্রূকুটির লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। এই শ্লেষ তাঁর হাতে রসাভাসের মতো মনে হয়। রাজনৈতিক মতবাদ তাঁর নিশ্চয়ই থাকতে পারে—আক্রমণও তিনি করতে পারেন—কিন্তু তাঁর স্নিগ্ধ ব্যঙ্গের মধ্যে জ্বালা ঠিকরে পড়লে ব্যথিত হওয়ার কারণ ঘটে।

শরীর অসুস্থ—বেশি লিখতে পারেন না—তবু তাঁর প্রতি আমাদের অনেক আশা। "রটন্তীকুমার" সে আশাকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে।

মনে হয়, এক জায়গায় পরশুরাম বাংলা দেশকে ঠকিয়েছেন। সে হল কিশোর সাহিত্য। তাঁর রচনায় নির্মল গল্পের যে নিঃশঙ্ক আনন্দ, যে কৌতুকের বিস্তার, তা আমাদের বালকপাঠ্য সাহিত্যকে অপূর্ব সমৃদ্ধি দিতে পারত। তাঁর 'বিরিঞ্চি বাবা' 'দক্ষিণরায়' কিংবা

'লম্বকর্ণ'কে একটু এদিক-ওদিক করে সাজিয়ে দিলে ছোটদের আসরে তা নিয়ে যে হুলুস্থুলু পড়বে—এ কথা জোর করেই বলতে পারা যায়। ছোটদের হাসির গল্পের যে-সব প্রধান উপকরণ, পরশুরামে তা ষোল আনাই আছে। সেই অম্লান আতিশয্য, সেই সিচুয়েশন সৃষ্টির অভাবিত naughtiness, সেই অতুলনীয় সংলাপ ঃ "এই যে দাড়ি দেখছেন, এর নাম ইম্পিরিয়াল! এর উদ্দেশ্য নাককে ব্যালান্স্ করা!" এই আশ্চর্য সম্ভার নিয়ে পরশুরাম যদি কিশোর সাহিত্যে আসতেন, তা হলে হয়তো সুকুমার রায় আর অবনীন্দ্রনাথের শূন্য জায়গার জন্যে আজ আমাদের ক্ষোভ করতে হতনা!

কিন্তু কিশোর সাহিত্য, অবনীন্দ্রনাথ কিংবা সুকুমার রায়ের কথা থাক। বাংলা সাহিত্যে পরশুরামের উত্তর পুরুষেরাই বা কোথায়? যে যন্ত্রণার যুগ আমাদের ঘিরে আজ অগ্নিচক্রের মতো ঘুরছে—আজও যে ক্ষোভ আর নিরাশার পঙ্কে আমরা আকণ্ঠ—তার মধ্যে 'হিউমারের' একটি নির্মল পদ্ম কি ফোটবার আশা আছে আর? 'সম্বুদ্ধ' ইঙ্গিত দিয়েছিলেন—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় কিছুটা অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু 'সম্বুদ্ধ' শুরু করতেই সারা করলেন, বাৎসল্যরসের করুণায় বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের লেখনী অন্য পথ ধরল। শ্লেষশিল্পী বনফুল এ-দিকে পা-ই বাড়ালেন না। মুজ্‌তবা আলী আছেন বটে কিন্তু তাঁর

পদ্ধতি আলাদা—তিনি যতটা বাঙালি, তার চাইতে বেশি আন্তর্জাতিক। নৈরাশ্যবাদী আমরা নই, তবু প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হচ্ছে ঃ কৌতুকরসিক বাঙালি জাতির 'লাস্ট টাইটান' কি পরশুরাম ?